ইউসুফ আল কারজাভি

বিজয়ী কাফেলা

ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক মুসলিম
প্রজন্ম গঠনের ইশতেহার

ফারুক আজম
অনূদিত

অনুবাদক পরিচিতি

মুহাম্মাদ ফারুক আজম।

প্রতিভাবান এক তরুণ লেখক ও অনুবাদক। জন্ম চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পূর্ব কাহার ঘোনা গ্রামে, ১ জানুয়ারি ১৯৯৬ সালে।

শৈশবে পিতাকে হারান। বেড়ে উঠেন মাতৃমমতার নিবিড় ছায়ায়। বড়ো ভাইয়ের হাত ধরে জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম-এ আসা। সেখানে তিনি ইবতেদায়ীতে ভর্তি হন। পর্যায়ক্রমে হেফজ শেষ করেন। শেষ করেন দাওরা হাদিস। আরবি ভাষা শেখার হাতেখড়ি এখানেই। এখানে পান আরবি-বাংলা সাহিত্যের রূপ-রস আস্বাদনের সুযোগ। পাশাপাশি তিনি দাখিল-আলিম পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।

প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ :

প্রিয় শাহজাদি, কীর্তিমানদের ছেলেবেলা

বইটি ভালো লাগলে
এক কপি হার্ডকপি
কিনে সংগ্রহে রাখুন

বিজয়ী কাফেলা

(ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক মুসলিম প্রজন্ম গঠনের ইশতেহার)

ইউসুফ আল কারজাভি

বিজয়ী কাফেলা

(ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক মুসলিম প্রজন্ম গঠনের ইশতেহার)

ফারুক আজম [অনূদিত]

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ইউসুফ আল কারজাভি

বিজয়ী কাফেলা

(ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক মুসলিম প্রজন্ম গঠনের ইশতেহার)

ফারুক আজম [অনূদিত]

প্রকাশনায়

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮

guardianpubs@gmail.com

www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com

প্রথম প্রকাশ : ২০ জুলাই, ২০২০

অনুবাদস্বত্ব : গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স

শব্দ বিন্যাস : গার্ডিয়ান টিম

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী

মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস

১১৯, ফকিরাপুল, জবেদা ম্যানশন, মতিঝিল, ঢাকা।

মূল্য : ২২০/-

ISBN : 978-984-8254-75-2

Bijoye Kafela by Yusuf Al Qaradawi, Published by Guardian Publications, Price TK. 220/- Only.

প্রকাশকের কথা

দুনিয়ার কোটি মানুষ এক সোনালি ভোরের প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ। মুক্তির সূর্য উঠবে বলে স্বপ্ন বুনছে লাখো-কোটি বনি আদম। কিন্তু কীভাবে আসবে সে ভোর? কারা আনবে সে ভোর?

জাহেলিয়াতের আঁধার কেটে কেটে যারা নতুন সমাজ বিনির্মাণ করবে, তাদের চরিত্র নিঃসন্দেহে অনুপম এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া অনিবার্য। তামাম দুনিয়ার বৈরিতা ও শত্রুতা বরদাশত করে যারা নতুন এক দুনিয়া গড়ার কারিগর হতে চায়, তাদের পথটা যে কুসুমাস্তীর্ণ হতে পারে না– তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

শুধু প্রত্যাশার পারদ ঊর্ধ্বে তুললেই হবে না; বিপ্লবীদের প্রথমে জানতে হবে, কাজটা আদতে কী। অন্ধকারে ঢিল ছুড়লে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আজকের দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম এবং ইসলামি চিন্তাবিদ ইউসুফ আল কারজাভি প্রত্যাশিত বিজয়ী কাফেলার চিত্র এঁকেছেন তাঁর *জিলুন নাসরিল মানসুদ* গ্রন্থে। মুক্তির আলোকমশাল যারা বয়ে বেড়াবে, কেমন হওয়া উচিত তাদের অবয়ব– লেখক এই গ্রন্থে অনুপম ভাষাশৈলীতে তা তুলে ধরেছেন। ইউসুফ আল কারজাভিকে নিয়ে নতুন কিছু বলা বাতুলতা বৈ কি! এই বিপ্লবী চিন্তকের অসাধারণ চিন্তাধারা বাংলাভাষী পাঠকদের মানসে তুলে ধরার দায় আমরা হৃদয়ের গহিন থেকে উপলব্ধি করছি।

তরুণ অনুবাদক ফারুক আজম ভাই অসাধারণ কাজ করেছেন, মাশাআল্লাহ! সম্মানিত পাঠকবৃন্দ প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই অনুবাদকের নিপুণ চিন্তার কারুকাজ দেখতে পাবেন। এই তরুণ এভাবে বাংলা সাহিত্যে অব্যাহতভাবে অবদান রাখলে বিশ্বাসীদের সাহিত্যদুনিয়া অনেক দূর এগিয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে পাশে থাকার জন্য মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ প্রকাশ করছি।

গ্রন্থটি ইসলামি সমাজ বিনির্মাণের কারিগরদের এতটুকুও উপকারে এলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
২২ জুলাই, ২০২০

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তায়ালার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। ইসলামই মানবজাতির একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, পথচলার নির্দেশিকা। জীবনপথের পাথেয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– 'আমি তোমাদের জন্য ইসলামকেই ধর্ম হিসেবে নির্বাচন করেছি।' তাই ইসলামই পার্থিব জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি। আখিরাতের মুক্তির সোপান, যে সোপান পেরোলেই জান্নাত– অনন্ত জীবনের নিরাপদ ঠিকানা।

ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই মানুষকে মুক্তির পথে ডেকেছে। আলোর দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। মানুষের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি নিয়েই ইসলাম যাত্রা শুরু করেছে। মানবমুক্তির স্লোগানই ঈমানের অনন্তকালের যাত্রাকে মহিমান্বিত করেছে। তাই ইসলাম মানুষের মুক্তির সনদে, অধিকার ফিরে পাওয়ার মন্ত্রে পরিণত হয়। দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে শুরু করে। হেরার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় জনপদ, দেশ পেরিয়ে মহাদেশ। ইসলামের করতলগত হয় মহাবিশ্ব!

কিন্তু ইসলামের এই যাত্রা নিষ্কণ্টক ছিল না। আলোর এই কাফেলা পদে পদে বাধার মুখোমুখি হয়েছে। প্রথম দিনই বাধার মুখে পড়ে। আবু লাহাবের তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলেছিল, 'এইসব ছাইপাস শুনতেই কি তুমি আমাদের একত্রিত করেছ?' কিন্তু ইসলাম থেমে যায়নি। আবু লাহাবের তাচ্ছিল্য ও বাধা ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারেনি। ইসলাম হলো খোদায়ি আলো। আর আলোকে বেঁধে রাখা যায় না। আলোর কিরণচ্ছটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়বেই। আবু লাহাবের নাকে-মুখে ধুলো দিয়ে ইসলাম এগিয়ে যায়। দুনিয়াকে জয় করে নেয়। কিন্তু আবু লাহাবরা বসে থাকে না। একের পর এক ষড়যন্ত্র বুনে যায়। ইসলামের চিরন্তন আলোকে নিভিয়ে দিতে উঠে-পড়ে লাগে। নানাভাবে, নানা কৌশলে ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় জানাতে চায়। মুসলমানদের ঐক্য নষ্ট করতে, ঈমানি শক্তি দুর্বল করতে দলবেঁধে পায়তারা চালায়। সময় বয়ে যায়। মুসলমানরা দুর্বল হতে থাকে। একসময় বিশ্বনেতৃত্ব থেকে মুসলমানদের বিদায় ঘটে। মুসলমানরা ক্ষমতাচ্যুত, রাজ্যহারা হয়ে যায়। নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হতে থাকে। মুসলমানদের বুকফাঁটা আর্তনাদ ও গগনবিদারী আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে।

হাজারে হাজারে লাখে লাখে মুসলিম ঘরছাড়া হতে থাকে। মুসলিম শরণার্থীর মিছিল দীর্ঘ হয়। সমুদ্রতীরে পড়ে থাকে আশ্রয়খোঁজা মুসলিম শিশুর নিথর দেহ!

মুসলমানদের এই দুর্গতি ও দুর্দশার কি কোনো শেষ নেই? তাদের এই গভীর খাদ থেকে কে টেনে তুলবে? এই অধঃপতন থেকে মুক্তির পথ কী? কার ওপর ভর করে মুসলিম বিশ্ব আবার তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে? কে সেই ক্রান্তিকালের ত্রাতা? দুর্দিনের বন্ধু?

মূলত এইসব প্রশ্নের উত্তরই এ বইয়ের পাতায় পাতায় খোঁজা হয়েছে। মুসলমানদের হারানো গৌরব ও লুপ্ত অতীত ফিরে পেতে কেমন প্রজন্ম দরকার এবং সেই প্রজন্মের কী কী গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, তাদের ভেতর-বাহির, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধ কেমন হওয়া চাই– এসব ব্যাপারই খোলাসা করা হয়েছে। যাদের হাতে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়েছে, তারা কেমন মানুষ ছিলেন। কোন গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য তাদের অমন ত্যাগী ও উৎসর্গী করে তুলেছিল, তাই অনেকটা মেলে ধরা হয়েছে। বর্তমানের মুসলিম যুবাদের কোথায় কোথায় সমস্যা, কোথায় কোথায় দুর্বলতা ও অসহায়তা, তা অনেকটা দরদি মালির মতোই পরম যত্নে তুলে ধরা হয়েছে।

যারা ইসলামের হারানো গৌরবময় অতীত ফিরে পেতে চায়, এই বই তাদের পথ দেখাবে। যারা দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম উম্মাহকে গভীর খাদ থেকে টেনে তুলতে চায়, এই বই তাদের জন্য। যারা সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে, যারা আদর্শ সমাজের রূপ দেখতে চায়, সর্বোপরি যারা একটা নিরাপদ মুসলিম বিশ্ব চায়, এই বই তাদের জন্য। এই বই প্রতিটি স্বপ্নবাজ মুসলিম তরুণের জন্য, যারা নিজেদের ইসলামের জন্য, ঈমানের পথে বিলীন করে দিতে চায়!

বইটির অনুবাদ সহজবোধ্য ও ঝরঝরে করার ক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। তারপরও মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই সচেতন পাঠকমহলের কাছে যেকোনো ভুল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। এই বইয়ের অনুবাদে আমাকে নানা সুহৃদ নানাভাবে সহযোগিতা করেছে। পরম করুণাময় তাদের ওপর আপন করুণার ধারা অবারিত করুন। আমিন।

ফারুক আযম,
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

- প্রশংসিত বিজয়ী প্রজন্ম ১১
- জাতির প্রাণ ইসলাম ১৪
- আমাদের প্রধান সমস্যা ১৭
- বিজয় যেভাবে আসে ১৯
- ঈমানের লালন ও পরিচর্যা ২৫
- ইসলামের সংস্কারকদের প্রধান কর্তব্য ২৬
- নারী-পুরুষ : অবদান উভয়েরই ৩০
- কুরআন-সুন্নাহর আয়নায় বিজয়ী প্রজন্ম ৩২
- জ্ঞাননির্ভর ও বাস্তববাদী প্রজন্ম ৩৮
- নিষ্ঠাবান ও খোদাভীরু প্রজন্ম ৪৪
- ইসলামি প্রজন্ম ৪৭
- জিহাদি ও দাওয়াতি প্রজন্ম ৪৯
- মানব সমাজে দরবেশ ৫৩
- মর্যাদাবান ও শক্তিশালী প্রজন্ম ৫৫
- ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থি প্রজন্ম ৫৯
- তাওবায় সমর্পিত প্রজন্ম ৬৪
- প্রত্যাশিত প্রজন্ম ৬৮
- এই উম্মাহর ক্ষয় নেই ৭১
- অনন্য গুণাবলি ৭৩

- চিরস্থায়ী উম্মাহ ৭৬
- এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির জাগরণ ৮১
- বোধের উদ্বোধন এবং জ্ঞানের উদ্ভাস ৮৪
- হৃদয়ের বন্দরে ঈমানি বিপ্লবের দাবানল ৮৬
- বিপ্লবের দায় ও দায়বদ্ধতা ৯০
- বিরামহীন কর্মস্পৃহাসঞ্চারী বিপ্লব ৯২
- শিক্ষিত যুবসমাজের বিপ্লব ৯৫
- নারী-পুরুষের বিপ্লব ৯৯
- বৈশ্বিক ও সর্বজনীন বিপ্লব ১০৩
- দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন ১৭৭

প্রশংসিত বিজয়ী প্রজন্ম

আমার কাছে এক বন্ধু এলো। তার চোখে-চেহারায় ছোপ ছোপ বিস্ময়। বুকবিদ্ধ বিষণ্নতা তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিচ্ছে। যন্ত্রণায় সে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। হেলে-দুলে পড়ি-মরি করছে।

কেন?

বৈরুতের নির্মম হত্যাযজ্ঞ তাকে নির্বাক করে দিয়েছে, অস্থির করে তুলেছে। সবরা ও সাতিলায় হাজারো মুসলিম লাশ হয়েছে, রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে। নির্বিচারে শিশু, নারী, বৃদ্ধদের হত্যা করা হয়েছে নির্ভয়ে, নির্লজ্জভাবে। গুঁড়িয়ে দিয়েছে ঘর-বাড়ি। নির্মমভাবে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে তাদের শেষ আশ্রয়টুকুও!

আরবরা কোথায় তাহলে?

আরবরা তো বটেই সমগ্র মুসলিম বিশ্ব নীরব, নিশ্চুপ। যেন কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে তাদের মাঝে। কোথাও কোনো রা শব্দটি নেই। নেই কোনো হৃৎকম্পন, প্রাণের তড়পানি। আর সভ্য পৃথিবী নির্বাক তাকিয়ে ছিল শুধু। না দিয়েছে কাউকে আশ্রয়, না কোনো আশ্রিতকে সরিয়েছে! 'আচ্ছা এসব কি তুমি দেখনি? শোনোনি?'

আমি জবাব দিই– 'শুনেছি তো, কেন শুনব না? এই নির্মম গণহত্যা দেখে দেখেই তো কোনোরকম বেঁচে-বর্তে আছি। হৃদয় ফেটে যায়। শিরা-উপশিরা কেঁপে ওঠে, রক্ত লাফিয়ে ওঠে। আরবদের পরাজয় আর মুসলমানদের অক্ষমতা দেখতে দেখতে মন বিষিয়ে ওঠে।'

তার আগেও মুসলিম দেশগুলোতে যুদ্ধের দামামা বেজেছে। হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত শহর বিরান হয়েছে। শহরের বাসিন্দাদের লাশের মিছিল গিয়েছে। মসজিদ গুঁড়িয়ে হয়েছে। নামাজরত মুসল্লিদের বর্বরোচিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। মুসলিম মা-বোনের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। আব্রুহীন হয়েছে হাজারো মুসলিম রমণী। কিন্তু কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই। নেই কোনো প্রতিউত্তর। কি আরব কি মুসলিম, কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে সবাই নীরব, নির্বিকার। অত্যাচারী নিপীড়কের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার কেউ নেই। বুক চেতিয়ে সামনে এসে দাঁড়ানোর মতো কোনো মর্দে মুমিন নেই। হুংকারে-হুংকারে কাঁপিয়ে তোলার মতো ব্যাঘ্রব্যক্তিটি আজ কোথায়? দুর্বল ও নিপীড়িতদের পাশে এসে দাঁড়ানোর মতো সাহসী কোনো মুসলিম কি নেই? সর্বত্র অদ্ভুত কবরের নীরবতা! রাতের গভীর নিস্তব্ধতা চেপে বসেছে পুরো মুসলিম বিশ্বজুড়ে। চারদিকে নিঃসীম শূন্যতা। কোথাও কেউ নেই!

তবে মাঝে মাঝে তাদের আওয়াজ শুনতে পাবে। তাদের বিকট চিৎকার তোমার কান ঝালাপালা করে তুলবে। সেই চিৎকার কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে নয়; নিজেদের বিরুদ্ধেই। নিজেরই আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে তাদের ভোঁতা হাতিয়ার! আর যদি কখনো তাদের বেশ চেতনাদীপ্ত হয়ে বীরদর্পে লড়ে যেতে দেখ, তাহলে বুঝে নেবে, অন্য কোনো মুসলিম শাসককে উৎখাত করতে তখন তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। মনে হয় যেন তারা সাহাবাচরিত্রের বিপরীত হওয়ার জন্য গোঁ ধরে বসেছে। কারণ, সাহাবারা ছিলেন–

> 'কাফিরদের প্রতি অতিশয় কঠোর আর নিজেদের মাঝে পরম কোমল।' সূরা ফাতাহ : ২৯

অপরদিকে এরা নিজেদের মাঝে খুবই হিংস্র, অথচ শত্রুদের প্রতি সদয়-সহৃদয়; মুমিনদের প্রতি খড়্গহস্ত, কাফিরদের জন্য বিনয়াবনত। যেন কুরআনে বর্ণিত ইহুদিদের গুণাবলি তাদের মুগ্ধ করে রেখেছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'তাদের নিজেদের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব অতি তীব্র, আপনি মনে করেন তারা ঐক্যবদ্ধ। আসলে তাদের হৃদয় বিক্ষিপ্ত। কারণ, তারা এক নির্বোধ জাতি।' সূরা হাশর : ১৪

এবার আমার বন্ধু হকচকিয়ে বলে উঠে– 'কিন্তু এই নিকষ-কালো অন্ধকারের কি কোনো অন্ত নেই? দীর্ঘ এই রাতের অবসান হবে কি? রাতের আঁধার ছিঁড়ে কি সকালের কোমল আলোয় পৃথিবী উদ্ভাসিত হবে না? এই জাতির কি এখনও আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিনে নেওয়ার সময় হয়নি? আর কত পথ চললে সৎ পথে ফিরে আসার উপলব্ধি হবে? এখনও কি শত্রুর বিরুদ্ধে একযোগে লড়ে যাওয়ার সময় হয়নি? কখন একই মঞ্চে এসে সমস্বরে গেয়ে উঠবে বিজয়ের গান? আর কতকাল নিজেদের গর্দান নিজেরা কাটবে? এখনও কি বিস্মৃতি থেকে জেগে উঠার সময় হয়নি? এখনও কি এই জাতির পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে সামনে চলার সময় আসেনি? আর কতকাল এই নিঃসীম অন্ধকারে পরাজয়ের ব্যর্থতা আর গ্লানি নিয়ে পথ চলবে? কখন মিলবে জয়ের দেখা? এই দুর্দিনের কি অবসান হবে না? আলোয় স্নাত সোনালি দিনগুলো কি আর আসবে না? ইয়ারমুকের যুদ্ধে ত্রাতা হয়ে আসা কোনো খালিদ কি আর আসবে না? কাদেসিয়া প্রান্তরের দুর্বিনীত বীর সেনানী সাদের আবির্ভাব আর হবে না? আজনাদাইনের মতো কোনো আমির কি হুংকার দেবে না? কিংবা স্পেনের মাটিতে তারিক বিন জিয়াদের দেখা মিলবে না? হিত্তিনের ময়দানে কি কোনো সালাউদ্দিনের জন্ম হবে না? কিংবা আইনে জালুত এবং কনস্টান্টিনোপল পদানত করা কুতুজ ও মুহাম্মদ ফাতিহের জন্ম দেওয়া মুসলিম মায়েরা কি বন্ধ্যা হয়ে গেছে?'

আমি স্থির-শান্ত কণ্ঠে বললাম– 'হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। এত ভেঙে পড়লে কি চলে? হতোদ্যম নয়; আমাদের হতে হবে আরও শক্ত মনোবলশালী। সবকিছুতেই আল্লাহ তায়ালার একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। তাতে কোনো হেরফের হয় না। আঁধার কেটে যাবে। অবশ্যই সকালের রাঙা আলোয় উদ্ভাসিত হবে প্রতিটি জনপদ, পুরো বিশ্ব। আর শেষ রাতের অন্ধকার একটু বেশিই জমাটবদ্ধ হয়। কিন্তু ক্ষণিক বাদেই সেই অন্ধকার কেটে যায়। ধীরে ধীরে ফর্সা হয়ে ওঠে। ভোরের আলো ফোটে, অরুণোদয় হয়। এই নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। তাই আমাদের খোদায়ি নিয়মের প্রকৃতি মাথায় রেখেই চলতে হবে। নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টা ধরে রাখতে হবে। কিছুতেই পিছু হঠা যাবে না। খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। সন্তর্পণে এগোতে হবে। আর দুটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে।'

জাতির প্রাণ ইসলাম

প্রথমত : ব্যক্তির যেমন প্রাণ থাকে, তেমনি জাতিরও প্রাণ থাকে। যে প্রাণ তাকে বাঁচিয়ে রাখে, সচল ও সজীব রাখে। আর সেই প্রাণ হারিয়ে গেলে জাতি স্বকীয়তাহীন হয়ে পড়ে। প্রাণশূন্য ব্যক্তিসমষ্টি হয়ে যায়, নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন ও বন্ধনহীন। কিংবা অনেকটা ভিত্তিহীন দালানের মতো, নড়বড়ে, ঝুঁকিপূর্ণ। ব্যক্তি যেমন প্রাণহীন হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি একটি জাতিও হয়ে যেতে পারে নিথর লাশ।

আমার কথা বিশ্বাস করো, আমাদের জাতি আজ প্রাণহীন নিথর দেহ, যেন খড়কুটোর সাথে ভেসে চলে। অথবা কেউ তাদের আপন দায়িত্ব ভুলিয়ে দিয়েছে। সম্পূর্ণ অকর্মা ও অলস হয়ে পড়েছে। তাদের মাঝে যেন প্রাণের স্পন্দন নেই। নেই জীবিত মানুষের আবেগ-উদ্বেল জীবন।

তুমি বলতে পারো, 'আমাদের জাতির আবার প্রাণ কী? আর কেই-বা তাকে এমনভাবে চালিয়ে নিচ্ছে? সম্পূর্ণ উদাসীন, খামখেয়ালিভাবে?'

এর জবাবে আমি নির্দ্বিধায় বলব– 'আমাদের জাতির প্রাণ হলো ইসলাম। ইসলামই অতীতে তাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে। বিচ্ছিন্নতার অসহায়তা, পথভ্রষ্টতার গ্লানি ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়েছে। ঐক্যের মিছিলে সমবেত করেছে। হিদায়াতের নুর ও জ্ঞানের আলোয় প্রদীপ্ত করেছে। সর্বোপরি তাকে সর্বোত্তম জাতিতে পরিণত করেছে– যারা মানবকল্যাণে নিবেদিত।'

তারা– আমাদের জাতি– ছিল মূর্তিপূজক, রাখাল ও মেষপালক। দেবীর অর্চনা ও মেষ পালন করেই জীবন কাটাত। সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ, বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে জীবন। সেখানে ঝড়ের গতিতে ইসলাম প্রবেশ করে। রাতারাতি বিপ্লব সূচিত হয়। ধীরে ধীরে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হয়। তাদের জীবনে ইসলাম যেন পরশপাথর হয়ে আর্বিভূত হয়। আর সেই পরশপাথরের ছোঁয়ায় বদলে যায় তাদের জীবন। একঘেয়ে মরুচারী জীবনের অবসান ঘটে। মেষপালক রাখাল হয়ে উঠে জাতির কর্ণধার। অন্ধকারের তিমির পথের আলোর মশালবাহী। ছড়িয়ে পড়ে পূর্বে–পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে। সাথে নিয়ে যায় কুরআনের শিক্ষা, প্রজ্ঞার দীপ্তি। ছড়িয়ে দেয় প্রেম ও ভালোবাসার অমীয় বাণী। আদল ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। মানুষকে ঈমান ও জ্ঞানের পতাকাতলে সমবেত করে। মানুষের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেয়। খোদায়ি দাসত্বের পথে আহ্বান জানায়। দুনিয়ার সংকীর্ণতা দূর করে দেয়। প্রশস্ত ও পরিব্যাপ্ত জীবনের সন্ধান দেয়। প্রচলিত ধর্মের দহন-পীড়ন থেকে মুক্তি দেয়। ইসলামের সমুজ্জ্বল ভুবনে স্বাগত জানায়। ইসলামের প্রাণ-পরশে বদলে যায় তাদের আটপৌরে একঘেয়ে জীবন!

পতনের যুগে ইসলামই ছিল এই জাতির একমাত্র অবলম্বন। ইসলামই নতুন করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শেখায়। যুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে প্রণোদনা দেয়। প্রাচ্য থেকে ধেয়ে আসা তাতারি ঝড়, পাশ্চাত্য থেকে তেড়ে আসা ক্রুসেডারদের রুখে দিতে সাহসিকতা জোগায়। হিত্তিনে ক্রুসেডারদের কোমর ভেঙে দিতে মনোবল জোগায় ইসলাম। আর ইসলামই আইনে জালুতে তাতারিদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে মূল ভূমিকা রাখে।

সেই ইসলামই বর্তমানে এই জাতির প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে পারে। তাকে পুনর্জীবন দিতে পারে। একতাবদ্ধ করতে পারে। ঈমানি শক্তিতে বলীয়ান করতে পারে। আর যারা চায় এই জাতি টিকে থাকুক– তবে ইসলামবিবর্জিত হয়ে, তারা মূলত এই জাতির বিলুপ্তিই কামনা করে। তাদের একমাত্র চাওয়া হলো এই জাতি পোশাকি হয়ে যাক, খোল-নলচে বদলে ফেলুক। সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা এক জাতিতে পরিণত হোক– যার পরিণতি হবে ভয়াবহ!

এরা হলো এই জাতির স্পষ্ট শত্রু। এই জাতির অগ্রগতিতে তাদের হিংসা হয়, গা জ্বালা করে। তারা ভীত, লোভী। হিংসা, ভয়, লোভ তাদের একত্রিত করেছে। অথচ তাদের সম্পর্ক বিবাদপূর্ণ। তাদের ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব অতি প্রবল। কিন্তু ইসলামকে ধূলিসাৎ করতে তারা এক, ঐক্যবদ্ধ। পাপাচারী ইহুদি, ধূর্ত খিষ্টান ও অবাধ্য কম্যুনিস্ট সবাই একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। তাদের কাজের ধরন ভিন্ন ভিন্ন। কখনো প্রকাশ্যে তো কখনো গোপনে, ছদ্মবেশে।

আমাদের প্রধান সমস্যা

আমাদের প্রধান সমস্যা হলো, এই জাতির আমজনতা অনেকটা আত্মভোলা, সমাচ্ছন্ন ও বিভোর। আপন দাওয়াত ও বার্তার ব্যাপারে উদাসীন, বেখবর। অথচ দাওয়াতই তার অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করে। সে তার বন্ধুর পরিচয় জানে না। শত্রুকে চিনে উঠতে পারে না। রাতের আঁধারে হওয়া ষড়যন্ত্র বুঝে না। মধুর আদলে দেওয়া 'জহর' অনায়াসেই গিলে খায়। কোনো বিকার নেই, অভিব্যক্তিশূন্য! সুন্দর মোড়কে এগিয়ে দেওয়া কুড়াল হাতে তুলে নেয়; আত্মবিনাশ ডেকে আনে। চমকপ্রদ স্লোগানে মেতে ওঠে। বাকচাতুর্য্যপূর্ণ কথার বিভ্রমে পড়ে যায়। কুফরিকে স্বাধীনতা বলে মনকে প্রবোধ দেয়। অশ্লীলতাকে শিল্পের মোড়কে ঢাকতে চায়। শৈথিল্যকে 'স্মার্টনেস' বলে মর্মপীড়া থেকে বাঁচতে চায়। বিষফোঁড়াকে স্বাস্থ্যবৃদ্ধি বলে সান্ত্বনা পায়। মরীচিকাকে পানি বলে মিছে আশ্বাসে ভোলে। হায়রে জাতি! এই আত্ম-প্রবঞ্চনার শেষ কোথায়?

আরেকটা সমস্যা হলো, সমস্যা আসলে অনেক– যার কবলে পড়ে গোটা জাতি ছিন্নভিন্ন তা হলো– মুসলিমদের মাঝে দৃশ্যমান ফাটল ও অদৃশ্যমান বিবাদ। এর পেছনের মূল কারণ হলো আঞ্চলিকতাপ্রীতি, তীব্র জাত্যাভিমান ও ভাষাপ্রীতি। আর আমদানিকৃত বস্তাপচা নানা মতাদর্শ; অনেক সংগঠন যেগুলোকে পথ চলার পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে তারা সরল পথ থেকে ছিটকে পড়েছে। ভ্রান্ততা আর পথভ্রষ্টতার মাঝে ডুবে গেছে। এ ছাড়াও অন্ধ অহমিকাও একটা বড়ো কারণ, যা প্রবৃত্তির পূজায় রত থাকে, হক ও সত্যের পথ থেকে দূরে থাকে। নগদ প্রাপ্তিকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতাকে গৌণ মনে করে। ব্যক্তিস্বার্থ বা আঞ্চলিক উন্নতিকে জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে দেখে।

আরও একটা শূন্যতা ও ফাটল রয়েছে, যা খুবই ভয়াবহ। প্রতিটি মুসলিম দেশের শাসক ও জনতার মাঝে এই শূন্যতা বিরাজমান। মুসলিম দেশগুলোর সাধারণ মুসলমানরা মন-মেজাজে, স্বভাব-প্রকৃতিতে, চিন্তা-চেতনায়, ইতিহাসে-ঐতিহ্যে ইসলামি ভাবধারাকে লালন করে। পক্ষান্তরে শাসকবর্গ উঠা-বসায়, শিক্ষা-দীক্ষায়, স্বার্থ-চিন্তায়, সম্পর্কে ও আত্মীয়তায় ইসলামবিরোধী শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাদের মন ও মগজে, রক্ত ও মাংসে এই বৈরী শিবিরের প্রভাব অতি প্রবল। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা, তাহজিব-তমদ্দুন ও রীতিনীতিকে ভয় পায়। সমাজে তার উপস্থিতি দেখলে কেঁপে ওঠে, অস্তিত্ব-সংকটে ভোগে। এমনকী ইসলামের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ না করেও! তারা একসময় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, জনগণ থেকে দূরে, ভিন্ন এক জগতে চলে যায়। সে জগতে জনগণের প্রবেশাধিকার নেই। যেন তারা পরস্পরবিরোধী দুটি সমান্তরাল সরলরেখা; কিছুতেই মিলিত হবে না!

এ তো গেল শাসকবর্গ ও আমজনতার সম্পর্কের কথা। এবার আসি সাধারণ মানুষ ও শিক্ষিত শ্রেণির সম্পর্কের কথায়। মোটাদাগে সাধারণ মানুষের চিন্তা ও ভাবনায়, ভাব ও অনুভবে, আচার ও প্রাত্যহিকতায় ধর্মের উপস্থিতি দেখা যায়। পক্ষান্তরে অধিকাংশ শিক্ষিত সমাজের মন-মস্তিষ্ক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার। বিদেশি সংস্কৃতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নষ্ট করে দেয়। আপন পথ ও গন্তব্য ভুলিয়ে দেয়। তাদের মাথাভর্তি ইসলামবিরোধী ধারণা। তাদের মাঝে মুসলিম জাতি, ইসলামের শরিয়াহ ও ইতিহাস সম্পর্কে প্রবল বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে তারা চিন্তায় ও পথ-পদ্ধতিতে সেক্যুলার হয়ে পড়ে। তখন তাদের কাছে ধর্ম হয়ে পড়ে গৌণ। কেবল মানুষ ও প্রভুর মধ্যে সীমাবদ্ধ কিছু আচার ও রীতিকেই তারা ধর্ম মনে করে। মনে করে, দৈনন্দিন কাজে ও প্রাত্যহিক কর্মযজ্ঞে ধর্ম ক্রিয়াশীল নয়। সমাজের কর্ম-প্রবাহে তার কোনো উপস্থিতি নেই। তার স্থান একমাত্র মসজিদে; নামাজ ও ওয়াজে। ধর্মশিক্ষা মাদরাসার বদ্ধ ক্লাসঘরে বন্দি। ধর্ম-আলোচনা স্থান করে নিয়েছে রেডিও-টিভিতে, পত্রিকার কলামে। ব্যস, ইসলামের কাজ শেষ! দায়িত্ব শেষ! আর যদি ইসলামকে জীবনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের সংবিধানরূপে গড়তে বলেন, তবে না! কিছুতেই এ কথা মানা যাবে না। এটা জঙ্গিবাদ, ধর্মকে পুঁজি করে ব্যাবসা!

বিজয় যেভাবে আসে

বিজয় হেসে-খেলে আসে না। এলোপাতাড়ি কর্মে বিজয়ের দেখা মেলে না। মাতাল উদ্ভট উটের পিঠে চড়েও বিজয় আসে না। বিজয় এত সহজ ব্যাপার না যে হাত বাড়ালেই কাছে চলে আসবে!

বিজয়ের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি, পথ-পদ্ধতি আছে। মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তার বর্ণনা দিয়েছেন। বান্দাদের সতর্ক করেছেন। নিয়ম-নীতি ও কৌশল মেনে চলার প্রতি জোর দিয়েছেন।

প্রথম কৌশল

বিজয় তো আল্লাহর হাতেই। যাকে তাঁর পছন্দ তাকেই তিনি বিজয় দান করেন। কেউ তাকে পরাজিত করতে পারে না। সমগ্র দেশের আপামর জনতা মিলেও তাকে দমন করতে পারে না। সে হয়ে উঠে দুর্বিনীত, অদম্য ও অপরাজেয়। আল্লাহ যার কপালে পরাজয় লিখে রেখেছেন, তার বি জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। হতে পারে সে সৈন্যসংখ্যা ও রসদ-উপকরণে অনেক শক্তিশালী।

কুরআনে স্পষ্টভাবে এই কথা বর্ণিত হয়েছে, তাতে কোনো সংশয় নেই। ইরশাদ হয়েছে–

> 'যদি আল্লাহ তোমাদের বিজয়ী করে, পরাজিত করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাদের পরাজিত করেন, এমন কেউ কি আছে যে তোমাদের বিজয়ী করতে পারে? আল্লাহর ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।' সূরা আলে ইমরান : ১৬

অন্য আয়াতে ইরাশদ হয়েছে–

> 'স্মরণ করো, যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করেছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিয়ে বললেন– আমি তোমাদের সাহায্যার্থে এক হাজার ফেরেশতার একটি বাহিনী পাঠাচ্ছি, যারা একের পর এক আসবে। এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কেবল এ জন্যই দিয়েছেন– যাতে এটা তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং যাতে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। অন্য কারও পক্ষ থেকে নয়; কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই সাহায্য আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।' সূরা আনফাল : ৯-১০

আল্লাহ তায়ালা কখনো কখনো কমসংখ্যক লোককে অধিকসংখ্যক সৈন্যের ওপর বিজয় দান করেন। যেমনটা তালুতের বিজয়, তাঁরা সংখ্যায় ছিল কম অথচ তারা জালুতের ওপর বিজয়ী হয়েছে। আর জালুতের সৈন্যসংখ্যা ছিল অধিক। তালুতের সৈন্যদের কেউ কেউ জালুতের সৈন্যসংখ্যা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মিনমিন স্বরে বলেছিল–

> 'জালুত ও তার সৈন্যদের ওপর বিজয়ী হওয়ার কোনো শক্তিই আমাদের নেই। আর যারা আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে আস্থাশীল ছিল তারা বলল– আল্লাহর রহমতে কত ছোটো দলই বড়ো দলের ওপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' সূরা বাকারা : ২৪৯

আল্লাহ কখনো কখনো নিরস্ত্র, সৈন্য-সামন্তহীন মানুষকেও সাহায্য করেন। যেমন রাসূল ﷺ-কে গুহায় সাহায্য করেছিলেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> 'যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না করো, আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন– যখন কাফিররা তাঁকে বের করে দিয়েছিল। তিনি হলেন দুজনের দ্বিতীয়জন– যখন তাঁরা গুহায় ছিলেন। তিনি সঙ্গীকে বলেছিলেন– "চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁকে এমন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, যাদের তোমরা দেখনি। আর কাফিরদের মাথা নীচু করে দিলেন। আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত, আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।' সূরা তাওবা : ৪০

দ্বিতীয় কৌশল

বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। আল্লাহই বিজয় দান করেন। বিজয় দেওয়ার পেছনে কিছু কারণ থাকে। আর তা হলো আল্লাহকে সাহায্য করা তথা আল্লাহর কাজে এগিয়ে আসা। খোদার রাহে জীবন উৎসর্গ করা। আল্লাহর জন্যই কাজ করা। তবেই আল্লাহ সাহায্য করবেন, বিজয় দেবেন। আর এই কথাই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। অনেকটা শর্তজুড়ে দেওয়ার মতো করেই, ইরশাদ হয়েছে–

> 'ওহে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনিও তোমাদের সাহায্যের জন্য হাত বাড়াবেন, তোমাদের দৃঢ়পদ রাখবেন।' সূরা মুহাম্মাদ : ৭

অন্য জায়গাতেও একই কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে বলার ধরন ও আঙ্গিকে কিছুটা ভিন্নতা নিয়ে। অনেকটা দৃঢ়তা ও প্রত্যয় নিয়ে, পণ ও শপথ করে। সংবাদ দেওয়ার ঢঙে কুরআন বলছে–

> 'আর কসম! আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে, যে আল্লাহকে সাহায্য করবে। নিশ্চয় আল্লাহ মহান শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।' সূরা হজ : ৪০

বিজয় অর্জিত হবে কেবল আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করলে, দ্বীনের বাণীকে সমুন্নত করলে এবং মানবজাতির মাঝে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কাজ করলে। এই সম্পর্কে কুরআনে পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের অব্যবহিত পরে বলা হয়েছে–

> 'আর তাদের যদি আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি, তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সমস্ত কিছুর পরিণাম তো আল্লাহর কাছেই।' সূরা হজ : ৪১

কুরআন আরও নানাভাবে এ কথা বলেছে যে সাহায্য অবশ্যই আসবে। তবে তা ঈমান, আল্লাহর জন্য লড়াই করার মাধ্যমেই অর্জিত হবে। আর যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ জন্যই ঈমান আনবে, তার জন্য জিহাদ করবে, অবশ্যই বিজয় তার পদচুম্বন করবে। এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আর এটা সত্য যে মুমিনদের বিজয়ী করার দায়িত্ব আমার ওপরই।' সূরা রুম : ৪৭

তিনি আরও বলেন–

> 'নিশ্চয় আমার সৈন্যরাই বিজয়ী।' সূরা ছফফাত : ১৭৩

তৃতীয় কৌশল

বিজয় তো আসবেই। মুমিনদের জন্যই বিজয়। তবে তা মুমিনদেরই অর্জন করে নিতে হবে– নিজেদের যোগ্যতায় ও আপন শক্তিতে। আর তাদের জন্যই বিজয়। তারাই বিজয়ের লক্ষ্য ও উপকরণ। এই ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্মানিত রাসূলকে সম্বোধন করে বলছেন–

> 'তিনিই আপনাকে এবং মুমিনদের সাহায্য করেছেন এবং তাদের মন ও মতের মিল করেছেন।' সূরা আনফাল : ৬২ ও ৬৩

আল্লাহ কখনো কখনো ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করেন, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়। যেমন : বদর, খন্দক ও হুনাইনের ময়দানে করেছেন–

> 'আর স্মরণ করুন সেদিনের কথা, যখন আপনার প্রভু ফেরেশতাদের সংবাদ দিয়ে বলেছিলেন– তোমরা মুমিনদের সুসংহত করো, আমি তোমাদের সাথে আছি।' সূরা আনফাল : ১২
>
> 'অতঃপর আমি তাদের কাছে দমকা বায়ু ও এমন সৈন্যদের পাঠিয়েছি, যাদের তোমরা দেখতে পাও না।' সূরা আহজাব : ৯
>
> 'অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ওপর রহমত বর্ষণ করেছেন এবং এমন সৈন্যদের পাঠিয়েছেন– যাদের তোমরা দেখতে পাও না। আর যারা কুফুরি করেছে, তাদের তিনি শাস্তি দিয়েছেন।' সূরা তাওবা : ২৬

আল্লাহ কখনো কখনো মানুষকে প্রকৃতির নানা অনুসঙ্গ দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেন। কখনো প্রকৃতিকে মানুষের অনুগত করে দেন, কখনো-বা বৈরী করে তোলেন। যেমন, খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকদের ওপর বাতাসকে বৈরী করে তোলেন। সেদিনের তুমুল ঝড়ো হাওয়ায় লন্ডভন্ড হয়ে যায় মুশরিকদের তাঁবু! সে দিকে ইঙ্গিক করে কুরআন বলছে–

> 'অতঃপর আমি তাদের কাছে তুমুল ঝড়ো হাওয়া পাঠাই।' সূরা আহজাব : ৯

বদরের যুদ্ধে বৃষ্টিপাত হয়। সেই বৃষ্টির ধারা খোদায়ি করুণা-ধারারূপে বর্ষিত হয়, যা মুমিনদের পঙ্কিলতা দূর করে, সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলে। তার বিবরণ কুরআনে স্থান পেয়েছে এভাবে–

> 'তিনি আকাশ থেকে তোমাদের কাছে বৃষ্টি অবতরণ করেন, যেন তোমরা পবিত্র হয়ে উঠতে পারো, শয়তানের প্ররোচনা ও দুর্বুদ্ধি দূর হয়ে যায়, হৃদয় ও মন যেন সুসংহত হয় এবং তোমাদের কদম যেন সুদৃঢ় হয়।' সূরা আনফাল : ১১

আবার আল্লাহ কখনো কখনো মুমিনদের শত্রুদের দ্বারাও সাহায্য করেন। তাদের হৃদয়ে ভয় ঢুকিয়ে দেন– যা তাদের মনোবল ভেঙে দেয়, ব্যক্তিত্ব দুর্বল করে ফেলে। আর ঠিক এমনটাই ঘটেছে ইহুদিগোত্র বনু নাজিরের বেলায়। কুরআন সেই ঘটনার বিবরণ তুলে ধরছে এভাবে–

> 'তিনিই আহলে কিতাবের কাফিরদের প্রথমবার সমবেতভাবে তাদের ঘর থেকে বের করে দেন। তোমরা চিন্তাও করোনি যে তারা বিতাড়িত হবে। তারা ভেবেছিল, তাদের দুর্ভেদ্য কেল্লা আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করবে। এমন এক জায়গা থেকে আল্লাহর শাস্তি নেমে এলো, যার ব্যাপারে তারা ভাবতেই পারেনি। তিনি তাদের হৃদয়ে ভয় ঢেলে দেন। তারা নিজেদের ও মুমিনদের হাতে ঘরবাড়ি ধ্বংস করে ফেলে। সুতরাং হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা! তোমরা সতর্ক হও।' সূরা হাশর : ২

কিন্তু বিজয়ের এই সব কলাকৌশল ও মাধ্যমগুলো মুমিনদের উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। বদর যুদ্ধে ফেরেশতারা এসে অংশগ্রহণ করেছে বটে, তবে তা হাওয়ার ওপর আসেনি; বরং এসেছে মুমিনদের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর। আল্লাহ তাদের বলেছেন–

> 'আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা মুমিনদের সুসংহত করো।' সূরা আনফাল : ১২

আহজাবের যুদ্ধে দমকা বায়ু ও সৈন্য পাঠিয়েছেন– যখন মুমিনরা অসহায় হয়ে পড়েছিল, বিপদের আশঙ্কা করেছিল। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> 'মুমিনরা বিপাকে পড়ে যায় এবং প্রবলভাবে হেলে পড়ে।' সূরা আহজাব : ১১

হুনাইনের যুদ্ধেও আল্লাহর সাহায্য আসে। কুরআন বর্ণনা করছে–

> 'আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ওপর রহমত বর্ষণ করেছেন।' সূরা তাওবা : ২৬

বনু নাজিরের যুদ্ধেও আল্লাহর সাহায্য এসেছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> 'তারা আপন হাতে ও মুমিনদের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছে।' সূরা হাশর : ২

ঈমানের লালন ও পরিচর্যা

আচ্ছা, বিজয় যদি মুমিনদের দ্বারাই আসে, মুমিনদের কল্যাণেই হয়, তাহলে এই মুমিনরা কি আকাশ থেকে পড়বে? না মাটি ফুঁড়ে উঠবে? না; বরং তারা এই পৃথিবীতেই জন্ম নেবে, বেড়ে উঠবে এবং বিকাশ লাভ করবে।

আর মানুষ তো কোনো বন-বাদাড়ে জন্ম নেওয়া আগাছা নয় যে অনায়াসেই জন্মলাভ করবে, বেড়ে উঠবে এবং মৌসুমে মৌসুমে ফলভারে আনত হবে; কোনো বীজ বপনের দরকার নেই, পরিচর্যার প্রয়োজন নেই। না, মানুষ তেমন নয়। মানুষের পরিচর্যা দরকার, যত্ন দরকার। নিবিড় পরিচর্যা ও গভীর তত্ত্বাবধানেই মানুষ গড়ে ওঠে। সহনশীল, নিষ্ঠাবান মালির দক্ষ হাতের পরম ছোঁয়ায় মানুষ প্রাণ পায়, বেড়ে ওঠে। বেড়ে উঠার নানা পর্যায়ে তার যত্ন নিতে হয়। নানা প্রতিকূলতা ও বৈরী হাওয়া থেকে মুক্ত রাখতে হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে তাকে গড়ে তুলতে হয়– তবেই তার মাঝে উপযোগিতা তৈরি হয়। অন্যথায় উপযোগহীন হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইসলামের প্রথম প্রজন্মের চিত্র ও চরিত্র বর্ণনা করেছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'আর ইঞ্জিলে তাদের উপমা হলো– যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে– চাষিদের আনন্দে অভিভূত করে– যাতে করে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন।' সূরা আল ফাতাহ : ২৯

ইসলামের সংস্কারকদের প্রধান কর্তব্য

মানুষ যেহেতু কোনো উদ্ভিদ নয়, সেহেতু যুগ-সচেতন মুসলিমসমাজ সংস্কারকদের প্রধান করণীয় হয়ে দাঁড়ায় একটা প্রজন্ম গড়ে তোলা, ঈমানি চেতনায় উজ্জীবিত আপাদমস্তক মুসলিম প্রজন্ম; যারা হবে বিজেতা প্রজন্ম। আর এমন প্রজন্মের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে মুসলিম উম্মাহ!

এমন প্রজন্মের হাত ধরেই ইসলাম আপন ঠিকানায় ফিরে যাবে। ফিরে পাবে ঝরনা-উৎসারিত জলের স্বচ্ছ ধারা। নিজের সঠিক মর্ম ও পূর্ণ তাৎপর্যে ভাস্বর হয়ে উঠবে, যে মর্মে কোনো সংশয়ের আড়াল কিংবা সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

এই ইসলাম ও পতনযুগের কুসংস্কার ও লোকাচারের বেড়াজালে আটকে পড়া ইসলামের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। পতনযুগের ইসলাম তীব্র ঘরানা-প্রীতি, প্রথাগত আচার-নির্ভরতা, স্থবির চিন্তা ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন দর্শনের আলোকে বিচারের মুখোমুখি হয়। ফলে অনেকটা মূলহীন ও স্বকীয়তা-বিবর্জিত হয়ে পড়ে। আর আমরা এখানে মূল ইসলামের কথা বলছি, যা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং যে ইসলামের প্রতি নবিজি ﷺ মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, নিষ্কলুষ সাহাবায়ে কেরাম ঈমান এনেছেন। মহান খলিফাগণ যার ওপর ভিত্তি করে শাসনভার পরিচালনা করেছেন। যার মজবুত ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে সভ্যতার সুদৃঢ়, সুউচ্চ সৌধ। আর যাকে অবলম্বন করে ধূলির পৃথিবী পৌঁছে গেছে আকাশের উচ্চতায়; যার শ্বাশত বাণী ও অবিনাশী চেতনার কাছে হার মেনেছে সমগ্র পৃথিবী এবং জ্ঞান ও বিশ্বাসের আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

এই ইসলাম সত্য-সুন্দর ও শৌর্য-বীর্যের ইসলাম। জ্ঞান, গবেষণা এবং জিহাদ ও কর্মদক্ষতার ইসলাম। ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বজনীন ইসলাম।

এই ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তির মান ও মর্যাদার নিশ্চয়তা দেয়। পরিবারে সৌহার্দ্য ও মৈত্রী স্থাপন করে। সমাজে অন্যের প্রতি দায় ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে। শাসন ও পরিচালনায় অন্যদের মত ও পরামর্শ গ্রহণের সংস্কৃতি চালু করে। উন্নয়নমুখী উৎপাদন নীতিমালা ও সুষম বিলি-বণ্টনব্যবস্থা প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে। সর্বোপরি সবার সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়।

এই ইসলাম ব্যক্তির জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে দেয়। খোদার রাহে জীবন সঁপে দেওয়ার মনোভাব সৃষ্টি করে। ফলে জীবনের পথ, গন্তব্য ও মনজিল হয়ে যায় এক ও অভিন্ন। কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা তার চলার গতি মন্থর করতে পারে না। সে সদা চলমান। আপন লক্ষ্যে স্থির ও অবিচল। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'বলে দিন, আমার সালাত, হজ ও কুরবানি, জীবন ও মৃত্যু সবকিছুই বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহর জন্য।' সূরা আনয়াম : ১৬

ইসলাম জীবনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করার বিরোধিতা করে। 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' এই নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে। জীবনের বিশেষ ক্ষেত্রে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করার অশুভ ধারণাকে অস্বীকার করে। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে দেখার দুষ্ট প্রবণতাকে সমর্থন করে না; বরং জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে। প্রতিটি সিদ্ধান্তের মূলে ও কেন্দ্রে থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

ইসলাম সর্বদাই ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলে, এমনকী আপন শত্রুর বেলাতেও এই নীতির ব্যত্যয় ঘটে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'কোনো জাতির প্রতি বিদ্বেষ যেন কিছুতেই তাদের প্রতি অবিচার করতে তোমাদের প্রণোদনা না জোগায়। ন্যায় ও ইনসাফ করো; সেটা তাকওয়া অবলম্বনের কাছাকাছি। আর আল্লাহকে ভয় করো।' সূরা মায়েদা : ০৮

তেমনিভাবে কারও প্রতি সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'তোমাদের মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার কারণে কোনো জাতির প্রতি বিদ্বেষ যেন সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করার প্রতি প্ররোচিত না করে। তোমরা তাকওয়া ও সদাচারের ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণের ক্ষেত্রে একে অপরের সহযোগিতা করো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।' সূরা মায়েদা : ২

ইসলাম সমাজতন্ত্র মতবাদের ধর্মহীনতার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পুঁজিবাদের আধিপত্য ও স্বেচ্ছাচারিতামূলক নীতির তীব্র সমালোচনা করে। শ্রেণি-সংঘাতের গোড়ায় কুঠারাঘাত করে। সম্প্রদায়িক নিপীড়ন দূর করে। ইসলাম অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার দিকে নয়, যা মানুষের মাঝে হিংসা ও প্রতিহিংসা সৃষ্টি করে; বরং ধার্মিকতার প্রতি আহ্বান করে– যা মানব-হৃদয়ে প্রেম ও ভালোবাসার সঞ্চার করে।

ইসলাম শাসকদের নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। অনৈতিক শাসনের বিরোধিতা করে। সেইসঙ্গে শাসকদের বলে– 'তুমি অত্যাচার করবে না, দমন-পীড়ন চালাবে না।' অন্যদিকে জনসাধারণকে বলে– 'তুমি কিছুতেই অন্যায়ের অনুগত হবে না।' মুসলিমদের বলে, তোমরা দুআয় বলবে– 'হে আল্লাহ! আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আমরা তোমার অকৃতজ্ঞ বান্দা নই। আর যে তোমার অবাধ্যাচরণ করে তাকে ছেড়ে দিই, অপসারণ করি।' আবার সর্বোত্তম জিহাদের ঘোষণা দিয়ে বলে– 'অত্যাচারী শাসকের নিকট সত্য কথা উচ্চারণ করা সর্বোত্তম জিহাদ।'

ইসলাম বিজয় অর্জন করে অকারণে নয়, দুর্বলের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। তার অধিকার নিশ্চিত করতে। শক্তিধরের টুঁটি চেপে ধরতে, তার অহংকার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। ইসলাম ধনীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে– যখন তারা দরিদ্রদের অধিকার আদায় করে না; আল্লাহর ধার্য করা হক আদায়ে বিরত থাকে। তখন ইসলাম বসে থাকে না। তার সূর্য-সন্তানদের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহ দিয়ে যায়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'তোমরা অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে না!' সূরা নিসা : ৭৫

এটাই সেই ইসলাম, যা এই বিজয়ী প্রজন্ম বোঝে ও লালন করে। এই ইসলামের প্রতিই তারা ঈমান আনে, তার প্রতি আহ্বান করে। তার আলোতে পথ পায়, হৃদয় আলোকিত হয়। পথ চলে এবং লক্ষ্য তাড়া করে। তার আলোতেই খোঁজে পার্থিব জীবনে অর্থময়তা ও সার্থকতা, উত্তরাধিকারের গুরুত্ব ও যুগের মর্ম। তার দিশা নিয়েই বন্ধুকে গ্রহণ করে, শত্রুকে চিনে নিতে পারে। আরও চিনতে পারে কে তার পথে আলো জ্বেলে যাবে, আর কে তাকে লক্ষচ্যুত করবে; সরল পথ থেকে তাকে ছিটকে ফেলে দেবে!

নারী-পুরুষ : অবদান উভয়েরই

বিজয়ী প্রজন্ম মূলত নারী ও পুরুষকে নিয়ে গঠিত হবে। ঈমানের আলোয় প্রোজ্জ্বল ও অনুগত মুসলিম নর-নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণেই এই প্রজন্ম প্রাণ পাবে। আর ইসলামে নারী তো পুরুষের সহযোগী; একে অপরের পরিপূরক। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> 'তোমরা একে অন্যের অংশ।' সূরা আলে ইমরান : ১৯৫

নারী যে পুরুষের সহযোগী, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আল্লাহ তায়ালার কথায়। তিনি আদম (আ.)-কে বলেন–

> 'তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো।' সূরা বাকারা : ৩৫

আর নারীও পুরুষের মতো দায়বদ্ধ। যেমন : কুরআনে বলা হয়েছে–

> 'তোমরা উভয়েই এই গাছের নিকটবর্তী হবে না।' সূরা বাকারা : ৩৫

আবার নারী প্রতিদান থেকে বঞ্চিতও হবে না। যেমন : কুরআনে বলা হয়েছে–

> 'নিশ্চয় আমি নারী কিংবা পুরুষ কোনো আমলকারীর আমল নষ্ট করি না।' সূরা আলে ইমরান : ১৯৫

আল্লাহ তায়ালার বার্তা নিয়ে রাসূল ﷺ যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তখন ইসলামের বিজয়-মিশনে, দাওয়াতের ময়দানে এবং দুনিয়ার বুকে ইসলামের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। আচ্ছা, ইতিহাস কি ইসলামের উষালগ্নে খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা ভুলতে পারবে? ইসলামের প্রথম শহিদ সুমাইয়া (রা.) যে প্রবল শাস্তি

ও কঠিন নিপীড়নের মুখেও অটল ছিল, এমনকী শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল, তবুও ইসলাম ত্যাগ করেনি– এই বীরাঙ্গনার কথা কি ইতিহাসে বিস্মৃত হতে পারে? অথবা হিজরতের দিন অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া আসমা বিনতে আবু বকরের কথা? উহুদের দিন অভাবনীয় বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উম্মে উমারা বা নাসিবার কথা? হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইমের বীরত্ব কিংবা নবিজির জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরে উম্মুল মুমিনিনদের ত্যাগ ও বিসর্জনের কথা কি ইতিহাস ভুলতে পারবে?

মুসলিম রমণীরা তো আপন সন্তানকে যুদ্ধে যেতে উৎসাহ দেবে, সাহসী করে তুলবে। স্ত্রী তো স্বামীকে জীবনবাজি রাখতে যুদ্ধে ঠেলে দেবে। মুমিন নারী এভাবেই আল্লাহর রাস্তায় নিজের ত্যাগ ও বিসর্জনের মাধ্যমে ভূমিকা রেখে যায়। যে নারী জ্ঞানী ও বিদুষী, সে অন্যের কাছে কুরআনের শিক্ষা ও হাদিসে মর্ম পৌঁছে দেবে, দ্বীনের সঠিক বার্তা পৌঁছে দেবে। বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা নিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবে। ভালো কাজের প্রতি মানুষকে নির্দেশ দেবে এবং খারাপ ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করবে। এমনকী খলিফাও যদি ভুল করে, তাঁকে শুধরে দিতে; মিম্বারে দাঁড়াতে হলেও পিছপা হবে না।

নারী সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য– যার উপস্থিতি সমাজকে সচল রাখে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> ‘আর মুমিনরা একে অপরের বন্ধু, তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বারণ করে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে। আর আল্লাহ তাদের অচিরেই সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।’ সূরা তাওবা : ৭১

আর এটা তো বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার যে নারীরা অতীতের মতো বর্তমানেও এগিয়ে আসবে। নানা কাজে ও বিভিন্ন উদ্যোগে নিজেকে তুলে ধরবে। ইসলামের দাওয়াত ও আহ্বানে অবদান রাখবে। ইসলামের নবজাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আত্মশুদ্ধি ও আত্ম-বিনির্মাণে মনোযোগী হবে। স্বামীকে ইসলামি কাজে ও আন্দোলনে সাহায্য করবে। নিজের সন্তান-সন্ততিদের ভালো কাজে উৎসাহ জোগাবে। নারীদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করবে। কারণ, তারা সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী। তাদের বাদ দিয়ে কিছুতেই ইসলামি সমাজ গড়া সম্ভব নয়।

কুরআন-সুন্নাহর আয়নায় বিজয়ী প্রজন্ম

বিজয়ী প্রজন্মের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের কথা কুরআন নিপুণভাবে তুলে ধরেছে। যারা কুরআন তিলাওয়াত করে এবং কুরআনের অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করতে চায়, তাদের কাছে এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই ধরা পড়বে। কুরআনের নানা সূরায়, নানা আয়াতে, এই প্রজন্মের নিপুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে–

> 'আমার সৃষ্টির মাঝে এমন একটা দল রয়েছে যারা সৎ পথের ওপর অবিচল থাকে, আর সঠিকভাবেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।' সূরা আরাফ : ১৮১

সৎপথ ও সত্য জীবনই তাদের লক্ষ্য, চলার পথের পাথেয় এবং সত্যই তাদের গন্তব্য। সৎ পথের দিকেই তারা মানুষকে ডেকে যায়। সত্যের আলোকছটা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে যায়। সৎ পথের নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞা দিয়েই তারা ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।

মহান আল্লাহ তায়ালা সূরায় মায়েদায় সৎ পথে অবিচল থাকা দলের কথা শোনায়, বেশ দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের সাথে। মুমিনদের সুসংবাদ দেয়। মুরতাদ ও ধর্মত্যাগীদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে। শেষ যুগে ধর্মত্যাগের বৈরী স্রোতকে রুখে দিতে ঈমানি চেতনায় উদ্দীপ্ত আলোর এই কাফেলাকে প্রস্তুত রাখে। ঈমানের পথে অবিচল থাকতে তাদের নির্দেশনা দেয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মাঝে কেউ ধর্মত্যাগ করলে নিশ্চয় আল্লাহ শীঘ্রই এমন একটা দল নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি পছন্দ করবেন এবং তারাও আল্লাহকে পছন্দ করবে। তারা মুমিনদের প্রতি খুবই কোমল ও সদয় আর কাফিরদের প্রতি কঠোর ও নির্দয় হবে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে এবং নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় করবে না। আর তা আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে তাঁর পছন্দ, একমাত্র তাকেই এই অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যশীল ও সর্বজ্ঞ।' সূরা মায়েদা : ৫৪

এগুলোই তাদের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র। তারা আল্লাহর সাথে ভালোবাসা ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ হবে। মুমিনদের সাথে সদয় ও কোমলতাপূর্ণ আচরণ করবে, কিন্তু কাফিরদের সাথে হবে কঠোর ও নির্দয়। সত্যকে বাঁচাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সত্যকে আগলে রাখাই তাদের জীবনে মূল লক্ষ্য। আর মানুষের কল্যাণকামিতা ও পরোপকারিতার মাঝেই তারা জীবনের অর্থ খুঁজবে। আল্লাহর কথা বলতে গিয়ে দ্বিধা করবে না, ভয় পাবে না। নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না।

সূরা তাওবাতে তাদের স্বভাব ও চরিত্র, প্রকৃতি ও মন-মেজাজ এবং আচার ও পদ্ধতি আরও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তাদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য তাদের মুনাফিকদের কুটিলতা ও ধূর্ততা থেকে আলাদা করে দেয়। মুনাফিকরা চরিত্রে ও মানসিকতায় একে অপরের থেকে অভিন্ন, তাদের রূপ, স্বরূপ ও অবয়ব একই। কুরআন তাদের পরিচয় তুলে ধরে বলে–

'তারা একে অপরের সহযোগী। খারাপ কাজের নির্দেশ দেয়, ভালো কাজ থেকে নিষেধ করে। এবং তারা দান করে না, হাত গুটিয়ে রাখে।' সূরা তাওবা : ৬৭

কিন্তু মুমিনরা তেমন নয়, তারা ব্যতিক্রম। কুরআন বলছে–

'মুমিন নারী ও পুরুষ একে অপরের বন্ধু ও সহযোগী। তাঁরা ভালো কাজের নির্দেশ করে এবং খারাপ কাজ থেকে বারণ করে। নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ করে। আল্লাহ অচিরেই এদের সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।' সূরা তাওবা : ৭১

সূরা বাকারার শুরুতেই এই মুমিন দলের কথা আমরা পাই– যেখানে মুত্তাকিদের কথা বর্ণিত হয়েছে, কুরআনের আলোয় আলোকিত মানুষের কথা বিবৃত হয়েছে। এই সূরার মাঝে পাই প্রকৃত ভালো মানুষের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি। কুরআন বলছে–

> 'এরাই যারা সত্য কথা বলেছে, আর এরাই হলো মুত্তাকি।' সূরা বাকারা : ১৭৭

সূরা মুমিনিনের শুরুতে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারীদের বর্ণনা পাওয়া যায়। সূরা ফুরকানের শেষের দিকে পাওয়া যায় আল্লাহর নেক বান্দাদের বিবরণ। সূরা রা'দের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে চতুর ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তির গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের কথা। কুরআন বলছে–

> 'যারা আল্লাহর সাথে করা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে না।' সূরা রা'দ : ০২

সূরা হুজুরাতের শেষে ঈমানের প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে। বেদুইনদের সংশয় ও সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে। তারা মনে করত, ঈমানের কোনো ফলাফল নেই। যারা অর্থহীন ও অযথা কাজ ভেবেছিল, তাদের অসার ধারণাকে উড়িয়ে দিয়ে কুরআন বলছে–

> 'আর মুমিন হলো তো তারাই, যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। তারপর কোনো প্রকার সন্দেহ করেনি এবং নিজেদের জীবন ও সম্পদ বাজি রেখে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, এরাই হলো সত্যবাদী বান্দা।' সূরা হুজুরাত : ১৫

কুরআনের অত গভীরে যাওয়ার দরকার নেই। যারা কেবল সূরা ফাতিহা পড়ে, তাদের চোখেই মুমিনদের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। তাদের সাধক হয়ে উঠার গল্প সামনে আসে। উচ্চ মর্যাদা অর্জনের প্রচেষ্টা ফুটে ওঠে। সূরা ফাতিহায় বর্ণিত হয়েছে–

> 'আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।' সূরা ফাতিহা : ৫

তারা আসলেই একত্ববাদী। আল্লাহর জন্যই তারা ইবাদত করে। তাঁর কাছেই সাহায্য চায়। অন্য কোনো সত্তার নিকট মাথা নোয়ায় না। অন্য কারও কাছে সাহায্য চায় না। একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে, তাঁর কাছেই ফিরে যায়।

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি যে জিনিস চায়, ব্যাকুলতা নিয়ে যে অমূল্য সম্পদ কামনা করে তা হলো– সরল ও সঠিক পথ। আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পথ– নবি, শহিদ, সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের পথ। তারা সর্বদাই পথভ্রষ্টদের পথ থেকে দূরে থাকতে চায়। অভিশপ্ত ব্যক্তিদের পথকে তারা ভয় পায়, এড়িয়ে চলে। বিপথগামী লোকদের পথ কিছুতেই তারা কামনা করে না। তারা চায় এমন পথ, যা এই সব লোকদের পথ থেকে আলাদা। যা তাদের গন্তব্যস্থল মনজিলে মকসুদে নিয়ে যাবে। আর তা হলো সরল পথ। সুতরাং তাদের আচরণে কিছুতেই যেন বিপথগামী জাহান্নামিদের চরিত্র ফুটে না ওঠে।

যে ব্যক্তি সুন্নাহকে পড়বে, হাদিসের অমীয় বাণীগুলো উলটাবে, তার মনের পর্দায় এই সোনালি প্রজন্মের পরিচয় ফুটে উঠবে। তাদের উত্তমরূপে চিনতে পারবে। কোনো আড়াল থাকবে না। কোনো প্রচ্ছন্ন ছায়া তার দৃষ্টিকে ঝাপসা করতে পারবে না। তার অন্তর্লোক সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

রাসূল ﷺ গায়েবের পর্দা ভেদ করে তাদের দেখেছেন। তাদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছেন। তাদের আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর তাদের মাঝে দেখেছেন বিপথগামী তিয়াত্তর দলের মাঝে একমাত্র 'মুক্তিকামী দলের' ছায়া। প্রবৃত্তি তাদের কাবু করতে পারবে না। কুকুর যেমন সঙ্গীকে নিয়ে যায়, তেমনি কামনার নেশা তাদের নিয়ে যেতে পারবে না। তারা ধনুক থেকে তির বের হওয়ার মতো করে ধর্ম থেকে বের হবে না; বরং তারা রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের অনুসৃত পথের ওপর অটল থাকবে। কিছুই তাদের টলাতে পারবে না।

নবিজি তাদের মাঝে 'যোগ্য উত্তরাধিকারীর' ছায়া দেখেছেন– যারা নববি উত্তরাধিকারের ভার বইবে একজন সচেতন ও চৌকস দায়ির মতো করে। আর সেই উত্তরাধিকারকে আগলে রাখবে অনেকটা বিশ্বস্ত প্রহরীর মতো করে, যারা নিদ্রাহীন চোখে পাহারা দিয়ে যায়। তাদের মতো নয় যারা–

> 'তাদের কাঁধে তাওরাত বহনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করেনি। তারা আসলে বই বহনকারী গাধার মতো।' সূরা জুমুআ : ৫

কিংবা তাদের মতোও নয়, যাদের আল্লাহ তাঁর নিদর্শন দান করেছেন, অথচ তারা তা থেকে সরে গেছে।

রাসূল ﷺ এই বিশ্বাসী প্রজন্মের মাঝে শেষ যুগে নিজের 'ভাইদের' ছায়া দেখতে পেয়েছেন, যেমনটা প্রথম যুগে সাহাবাদের মাঝে দেখেছেন। তাদের প্রতি তিনি ব্যাকুল ছিলেন। এমনকী তাদের জন্মের পূর্বে তাদের দেখতে চেয়েছেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

> 'আমার খুব ইচ্ছে, যদি আমার ভাইদের দেখতে পেতাম! সাহাবারা বলল– ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন– তোমরা আমার সাহাবা (সাথি) আর আমার ভাই হলো এমন একটা দল, যারা পরে আসবে।'

তাদের মাঝে তিনি দেখতে পেয়েছেন সেসব 'অপরিচিতদের', যারা হারানো সুন্নাহকে নতুন প্রাণ দেবে। মানুষের অজ্ঞতার কারণে বদলে যাওয়া সুন্নাহকে সংস্কার করবে। লুপ্ত সুন্নাহর পুনরুদ্ধার করবে। তাদের জন্য মোবারকবাদ!

নবিজি তাদের মাঝে ঈমানের পরাকাষ্ঠা দেখেছেন। তারা রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অথচ তাঁকে দেখেনি। তাঁর ওপর অবতীর্ণ হওয়া কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমল করেছে।

তাদের মাঝে ফিতনার যুগে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা অবিচল ঈমানদারদের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন। যারা শেষ যুগের হাজারো প্রতারক ও ভণ্ডের মাঝে প্রকৃত দ্বীনের ওপর টিকে থাকবে। অথচ দ্বীনের ওপর টিকে থাকা তখন অনেকটা হাতের তালুতে জ্বলন্ত আগুনের অঙ্গার রাখার মতোই কঠিন হবে। তাই এই সময়ে যারা ভালো কাজ করবে, তাদের প্রতিদান হবে স্বাভাবিক অবস্থায় ভালো কাজ করা ব্যক্তিদের পঞ্চাশ গুণ। কারণ, তারা সমস্ত বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মুখে দ্বীনের ওপর অবিচল ছিল। ধৈর্যশীল ও অটল ছিল।

নবিজি তাদের মাঝে পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্তদের মাঝে সত্যের পতাকাবাহী দলকে দেখতে পেয়েছেন। যারা বিদআত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজে নবিজির সঠিক ও প্রকৃত অনুসরণের দিকে আহ্বান করে যাবে। যারা ভারসাম্যপূর্ণ কথা বলবে। সীমালঙ্ঘনকারীদের দলভুক্ত হবে না। কোনো বিধান কাটছাঁট করার মানসিকতাও পরিহার করবে। সৎ পথের দিশা নিয়ে পথ চলবে। পথভ্রষ্ট ও পথহারা লোকের পথ পরিহার করবে।

তাদের মাঝে সেই বিজয়ী দলকে দেখেছেন, যাদের হাতে মুক্ত হবে ফিলিস্তিন। তারা ইহুদিদের বিষদাঁত ভেঙে দেবে। গোটা জাতি এই দলের সাথে এসে মিলবে। সমগ্র পৃথিবী তাদের কাতারে এসে দাঁড়াবে। এমনকী ছোটো নুড়ি পাথর থেকে শুরু করে গাছপালা সবকিছুই। সবাই এই দলের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। শত্রুর বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রুখে দাঁড়াবে। ইহুদি দেখা মাত্রই বলে উঠবে– 'হে আব্দুল্লাহ! এই যে ইহুদি, আমার পেছনে লুকিয়ে আছে। এসো, একে হত্যা করো।' বুখারি ও মুসলিম

জ্ঞাননির্ভর ও বাস্তববাদী প্রজন্ম

বিজয়ী প্রজন্ম পথ চলবে পরিকল্পিতভাবে, মেপে মেপে। অপরিকল্পিত ও অসংযত পদক্ষেপে টাল খেয়ে পড়বে না। হইচই ও টালমাটাল পরস্থিতি এড়িয়ে চলবে। শান্ত প্রকৃতিতে ও ধীর মেজাজে সিদ্ধান্ত নেবে। সুচিন্তিত উপায়ে কাজ করবে। তাড়াহুড়ো করবে না। অস্থির হবে না। বাস্তবতার আলোকে ও পরিস্থিতির নীরিখে বিচার করবে। ধারণাপ্রসূত ও অনুমাননির্ভর কথা বলবে না। মাটির ওপর চলে তারা, কিন্তু দৃষ্টি আকাশে। অলীক কল্পনা আর অর্থহীন দিবাস্বপ্নে হারিয়ে যায় না, বিভ্রমে পড়ে না। ডানাবিহীন উড়তে যায় না। পানিহীন রাজ্যে সাঁতার কাটার বোকামি তাদের পেয়ে বসে না!

এই প্রজন্ম আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে উঠবে, কিন্তু কিছুতেই বাস্তবতা-বিবর্জিত চিন্তায় আটকে পড়বে না। স্বপ্নের বন্দরে দোল খাবে বটে, কিন্তু সমুদ্রের গর্জন, উত্তাল ঢেউয়ের চোখ-রাঙানি ও ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবের কথা ভুলবে না। কারণ, সে জানে যুগ বদলে যায়। সব দিন সমান যায় না। পৃথিবী এক পরিবর্তনশীল জগৎ। এর উত্থান-পতন আছে। আর সময় এক নির্মম প্রতিযোগিতা ক্ষেত্র– কখনো একপক্ষের জয় কখনো অন্যপক্ষের। সব দিন কি সমান যায়? না, কখনোই নয়! কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'আর মানুষের মাঝে সেই সব দিনগুলো ফিরে ফিরিয়ে আনব।'
> সূরা আলে ইমরান : ১৪

এই প্রজন্ম বাস্তবসম্মত কাজ করবে। অর্থহীন কাজে সময় নষ্ট করবে না। সমুদ্রে চাষ করতে যাবে না। স্থলপথে সাঁতার কাটার মতো বোকামিতে জড়াবে না কিংবা পাথরের গায়ে বীজ বপন করবে না। কল্পরাজ্যে পরিকল্পনা আঁটবে না। বালির ঢিবিতে প্রাসাদ তৈরি করবে না।

আল্লাহর দয়া থেকে হতাশ হয়ে পড়বে না। তাঁর রহমতের ছায়া থেকে নিরাশ হবে না। নিজের সক্ষমতার পরিধি ও পারঙ্গমতার ব্যাপ্তি সম্পর্কে অবগত থাকবে। সময়ের আগে ফসল ঘরে তুলতে ব্যাকুল হবে না। অসময়ে কিছু কামনা করবে না। নিজের ক্ষেত্র ও পরিসরের বাইরে নিজেকে সম্পৃক্ত করবে না। কিছুতেই অজানা-অচেনা ফাঁদে পা দেবে না, যেন সে আটকে না পড়ে, বন্দি না হয়। কবি বলেছেন–

> 'সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি তো সে-ই, যে তৃষ্ণায় মরে গেলেও
> বের হওয়ার পথ না জেনে পানির ঘাটে নামবে না।'

এই প্রজন্ম শরিয়াহর বিধিবিধান যেমন পালন করবে, তেমনি প্রকৃতিতে আল্লাহ তায়ালার যে রীতিনীতি আছে, তা-ও মেনে চলবে। উত্তম ধৈর্য, দীর্ঘক্ষণ শ্বাস নিয়ে কাজ করার কৌশল আয়ত্ত করবে। একটা বীজ গজানো পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে। একটা অঙ্কুরে পাতা আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে। মুকুল আসা পর্যন্ত কুঁড়ির দিকে চেয়ে থাকবে। অপেক্ষা করবে মুকুল থেকে ফল আসা পর্যন্ত। আর ফল পাকা পর্যন্ত অপেক্ষার প্রহর গুনবে এবং দিনশেষে আল্লাহর অনুগ্রহে এই ফলটা খাবে!

এই প্রজন্ম জ্ঞানের আলোয়, বুদ্ধির প্রভায় এবং প্রমাণের যৌক্তিকতায় বিশ্বাসী। তারা সংস্কারমুক্ত। মনগড়া কথা ও অসার বক্তব্য তারা বিশ্বাস করে না। আর যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ পড়েছে, সে জানে চিন্তা ও গবেষণা করা ফরজ। ভাবনার গভীরে ডুব দেওয়া এক প্রকার ইবাদত। জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হওয়া যুদ্ধজয়ের শামিল। কোনো বাছ-বিচার না করে পুরোনো ও প্রাচীন জিনিসকে আঁকড়ে ধরা অজ্ঞতা ও স্থবিরতা। পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ বুদ্ধির দেউলিয়াপনা ও মস্তিষ্কের বিকারগ্রস্ততা। তাই এই প্রজন্ম কথা বলার আগে চিন্তা করবে। কাজে নামার আগে শিখে নেবে। বিশ্বাস করার আগে প্রমাণ যাচাই করে নেবে। বাস্তবায়ন করার আগে পরিকল্পনা করবে। প্রমাণবিহীন কোনো মতামতই গ্রহণ করবে না। ভিত্তিহীন কোনো কথাই তার কাছে পাত্তা পাবে না। তার চোখের মণিতে সদা জ্বলবে আল্লাহর বাণী। ইরশাদ হয়েছে–

> 'যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে আমাকে তত্ত্বনির্ভর কথা বলো।' সূরা আনআম : ১৪৩

> 'তোমাদের কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে? থাকলে আমার কাছে তা বের করে নিয়ে এসো।' সূরা আনআম : ১৪৮
>
> 'বলে দিন, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো।' সূরা বাকারা : ১১১

আর বিজয় তো আসবে দৃঢ়চেতা মনোবল, লড়াকু মনোভাব ও অটল বিশ্বাসের হাত ধরে। গোপন পরিকল্পনা, নীরব সাধনা ও নিরন্তর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। হেসে-খেলে, শুয়ে-বসে কিংবা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে বিজয় অর্জন করা যায় না। চিৎকার-চেঁচামেচি, আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন ও অতি সমারোহে বিজয় পাওয়া যায় না। বিজয় কোনো সহজ ব্যাপার নয় যে হাত বাড়ালেই মিলবে!

আর সাচ্চা ও খাঁটি ঈমান মুমিন-হৃদয়ে ঝড় তোলে। কাজে ও উদ্যমে, চেষ্টা ও নিষ্ঠায় যার প্রতিফলন পাওয়া যায়। মানুষ সৃষ্টির মূল লক্ষ্যই হলো কাজ। কাজই মানুষকে স্বতন্ত্র সত্তা দিয়েছে। কাজের মধ্যেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লুকিয়ে আছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'যেন তিনি তাদের মাঝে উত্তম কর্মীকে খুঁজে বের করতে পারেন।'
> সূরা কাহাফ : ৭

তাই মুমিনদের কাছে কাজ একটা ফরজ বিধান। কাজের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া ইবাদত। কাজ আদায়ে সহায়তা করা জিহাদ। তারা জানে, ভালো কাজ বৃথা যায় না। প্রতিদান অনিবার্য। খোদার প্রতিশ্রুতির একচুলও ব্যত্যয় ঘটবে না। বিন্দু পরিমাণ অন্যায্য হবে না– এই বিশ্বাস তাদের আছে।

এই প্রজন্ম ইসলামের কল্যাণে এক কাতারে এসে দাঁড়ায়, সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে। ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য একসঙ্গে লড়ে যায়, অভিন্ন সুরে গায়। তারা জানে, এই কাজ তাদের করতেই হবে। এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করতেই হবে। কারণ, পবিত্র দ্বীন ইসলাম এই কাজ তাদের ওপর ফরজ করেছে। দুনিয়ার চলমান পরিস্থিতি ও কঠিন বাস্তবতা তার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়েছে। আর ব্যক্তির সংস্কার একমাত্র সমষ্টির ছায়ায় সম্ভব। কারণ, ব্যক্তিই তো সমাজের মূল!

এই প্রজন্ম কুরআনের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে। তাদের প্রতি প্রভুর সম্বোধনের ধরন ও রীতি তাদের অজানা নয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'হে ঈমানদারগণ!'

সমষ্টিকে লক্ষ্য করে করা এই সম্বোধনের মর্ম তাদের বোধের অতীত নয়। কুরআনের এই বাণী পরোক্ষভাবে তাদের বলে দেয়– 'খোদার হুকুম ও বিধান বাস্তবায়নে তোমরা একে অপরের সহযোগী!' নিষেধাজ্ঞা আরোপিত বস্তু থেকে দূরে থাকার ব্যাপারেও তারা একে অপরের পরিপূরক!

তারা প্রতি নামাজের মাঝে, একান্তে মোনাজাতে যখন বলে ওঠে–

> 'আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য কামনা করি। আমাদের সৎ পথের দিশা দিন।' সূরা ফাতিহা : ৫-৬

তখন কিছুতেই নিজের, একজনের কথা বলে না; বরং বলে ওঠে– 'আমরা', 'আমাদের'! বহুবচন ব্যবহার করার এই উদারনৈতিক মানসিকতা পোষণ করে চলে। এমনকী একাকী প্রার্থনারত হলেও হৃদয়ে রয়েছে সামগ্রিক চিন্তা। তাদের ঠোঁটে উচ্চারিত হয় বহুবচনবোধক শব্দ। আর এভাবে তাদের মনোজগৎ থেকে দূর হয়ে যায় ব্যক্তি-চিন্তা, ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা। তার জায়গায় স্থান করে নেয় জনস্বার্থ, সামগ্রিক কল্যাণ!

এই প্রজন্ম কুরআনের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে। তারা আল্লাহর রশ্মিকে আঁকড়ে ধরে। কখনো বিচ্যুত হয় না, ছেড়ে দেয় না। সৎকাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়ায়। ধৈর্য ও সত্যকে আঁকড়ে ধরার পরামর্শ দেয়। সদুপদেশ দেয়। পূর্ববর্তী জাতির মতো অহেতুক তর্কে জড়ায় না। অর্থহীন ফাঁকা বুলি ছোড়ে না। তাদের মতো নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় না! পারস্পরিক বিবাদ বাড়িয়ে নিজেদের সম্পর্ক বৈরী করে না। দীনতা ও হীনতাকে মেনে নেয় না; বরং তারা বুদ্ধিমান, 'স্মার্ট', বালকসুলভ আচরণ করে না।

হ্যাঁ! এই বিপ্লবী প্রজন্মের কথাই বলছি। তাদের কাছে রয়েছে আসমানি দ্বীন, গৌরবময় অতীতের সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং নির্মম বাস্তবতার তিক্ত সবক। তারা জানে, ব্যক্তি সর্বদাই একা। কিন্তু যখন তারা সমষ্টির কাতারে মিলিত হয়, ঐক্যের কাতারে এসে দাঁড়ায়, তখন তাদের সংখ্যা বেড়ে যায়।

তারা জানে, ব্যক্তি একা দুর্বল, সমষ্টিতে সবল হয়ে ওঠে। এক হাতে কি তালি বাজাতে পারে? এক ব্যক্তির চিৎকার আর যায় কত দূর?

আর খোদার রহমত তো সমষ্টির সাথে। দলচ্যুত বকরি তো বাঘের পেটের খোরাক হয়! অল্পসংখ্যক মানুষ যখন মিলিত হয়, তখন গড়ে উঠে ঐক্য। সেই ঐক্যই সংখ্যালঘুর দুর্বলতা দূর করতে পারে, অসহায়তা ঘোচাতে পারে, শক্ত ও সুদৃঢ় প্রাচীর গড়ে তুলতে পারে। পক্ষান্তরে অধিকসংখ্যক মানুষের মতভিন্নতা ও মতপার্থক্য তাদের শক্তি দুর্বল করে দেয়, ভিত্তি নড়বড়ে করে দেয়। সেই সংখ্যাধিক্য তেমন কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

মূল কাজ হলো ভেতর-বাহির সব জায়গায় ইসলামের ভিত্তি শক্ত করা ও দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়া। আর এই মহান কাজ কি একজনকে দিয়ে সম্ভব? একজন কি করে এই বিশাল দায়িত্ব আদায় করবে? এর জন্য দরকার দলগত প্রচেষ্টা ও সামষ্টিক প্রয়াস। আর এই কাজটি কিছুতেই উম্মাহর ঐক্য ছাড়া সম্ভব নয়। এই কাজ যেমন ওয়াজিব, তেমনি ঐক্যও ওয়াজিব।

এই প্রজন্ম সচেতন। কালের ভাষা ও বাস্তবতার বার্তা তারা বোঝে। তারা উদাসীন ও নির্বিকার নয়। বিচ্ছিন্ন ও সমাজবিচ্যুত নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা বাতিলের গতিবিধি বোঝে। তাদের নষ্ট আদর্শ আর অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা মতাদর্শের দৌড়ও জানে। তাদের অভিন্ন প্লাটফর্মে সমবেত হওয়ার খবরও রাখে। সুতরাং তারা বুঝতে পারে, সত্যের পতাকাবাহী দলকে নিজেদের সঠিক ও সত্য মতাদর্শ নিয়ে একত্রিত হতে হবে। নিজেদের মাঝে মতভেদ থাকলেও কঠিন মুহূর্তে, বিপদের সময়ে এবং উম্মাহর প্রয়োজনে তারা এক হতে জানে। কারণ, বিপদ বিপদগ্রস্তদের এক কাতারে এনে দাঁড় করায়। অনেক সময় যুদ্ধ ঘোর প্রতিপক্ষকেও সম্মিলিত শত্রুর মোকাবিলায় এক কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'যারা আল্লাহর পথে এক কাতারে যুদ্ধ করে, আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাদের পছন্দ করেন। তারা যেন সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো।' সূরা ছফ : ০৪

ছড়ানো-ছিটানো ইট সংখ্যায় যত বেশিই হোক, কোনো উপকারে আসে না। বিক্ষিপ্ত ইট যতই শক্ত ও মজবুত হোক, তার কোনো কার্যকারিতা নেই।

তা দিয়ে কোনো কিছু গড়া যায় না। তবে যদি সেগুলো বিন্যস্ত উপায়ে সুনির্দিষ্ট নিয়মে একটার সাথে অন্যটার নিপুণভাবে জোড়া দেওয়া যায়, তাহলেই সেগুলো উপকারে আসবে। তা দিয়ে সুরম্য দালান ও সুউচ্চ ইমারত তৈরি করা সম্ভব।

আর এই জন্য তারা অর্থাৎ এই প্রজন্ম ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হাতে নেয়। নিজেদের সমমনাদের খুঁজে নেয়; যারা সত্যকে খুঁজে বেড়ায়, কল্যাণের দিকে ডেকে যায়, বাতিল ও মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে, অশুভ ও খারাপকে অস্বীকার করে, সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকতে বলে। যেন তারা একে অপরের হাত ধরতে পারে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরিশ্রম করতে পারে। পরস্পর মিলে যখন কাজ করবে, বিক্ষিপ্ত ইট যখন সঠিক উপায়ে গাঁথা শুরু করবে, তখনই তৈরি হবে শক্ত মজবুত দেয়াল। আর কয়েকটা দেয়ালের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে দৃষ্টিনন্দন স্বপ্নের সুরম্য প্রাসাদ। এমনই কয়েকটা বাড়ির সমন্বয়ে তৈরি হবে পরিপাটি শহর। আর এই সামগ্রিক কাজের পথে এগোবে। নীরবে কাজ করে যাবে। ধৈর্য ও সত্যকে আঁকড়ে ধরে পথ চলবে। সুখ-দুঃখের সময় একে অপরের পাশে থাকবে। তিলে তিলে গড়ে তুলবে একেকটি প্রাসাদ। বিরামহীন জিহাদ করে যাবে। তাদের নেই কোনো ক্লান্তি, নেই কোনো অবসাদ।

তারা তাকওয়া ও সদাচরণের ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আনন্দ ও কষ্টের সময় পরস্পর পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়ায়। মুমিন তো মুমিনদের জন্যই। তারা যেন এক সুদৃঢ় প্রাসাদ– যে প্রাসাদ কিছুতেই ভেঙে পড়ে না।

নিষ্ঠাবান ও খোদাভীরু প্রজন্ম

বিজয়ী প্রজন্ম খোদাভীরু প্রজন্ম। মাটির পৃথিবীতে তারা আখিরাতের অন্তর নিয়ে পথ চলে। তারা যাপন করে দুনিয়ার জীবন, অথচ তাদের হৃদয় আল্লাহর আরশেই ঝুলে আছে– যেখানে সাত শ্রেণির মানুষ ছায়া পাবে, যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না।

তারা খোদার আলোতেই পথ আলোকিত করে। তাঁর ভালোবাসা দিয়েই হৃদয় সিক্ত করে। তাঁর জিকির দিয়েই তাদের জিহ্বা সজীব রাখে। তাঁর আনুগত্য দিয়েই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ব্যস্ত রাখে। তারা আল্লাহর দ্বারাই চালিত, আল্লাহর জন্যই তাদের পথচলা। আল্লাহর নামেই শুরু হয় তাদের যাত্রা আর আল্লাহর কাছেই শেষ হয় সেই যাত্রা। আল্লাহই তাদের রক্ষাকবচ। আল্লাহর জন্য তাদের উঠা-বসা। আল্লাহর কাছে তাদের মদদ ও সাহায্য। আল্লাহর কাছেই তারা ফিরে যায়। আল্লাহর কিতাবের আলোকেই তাদের বিপ্লব, তাদের শান্তি। যদি তারা ভালোবাসে, তা আল্লাহর জন্যই। আবার যদি ঘৃণা করে, তাও আল্লাহর জন্যই। আল্লাহর জন্য নামাজ আদায় করে, দান করে, দান থেকে বিরত থাকে, যুদ্ধ করে, সন্ধি-চুক্তি করে। তাদের শুরুই হয় আল্লাহ দিয়ে। তাদের শেষ লক্ষ্যও আল্লাহ। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ।' সূরা হাদিদ : ০২
>
> 'আর নিশ্চয় তোমার প্রভুই শেষ গন্তব্য।' সূরা নাজম : ৪২

তাদের মাঝে নিষ্ঠা ও নিবেদিত প্রাণ মনোভাব দেখা যায়। তাদের নিষ্ঠাই তাদের শক্তি, যা তাদের অন্যদের থেকে আলাদা করে। তারা একমাত্র আল্লাহর জন্যই দ্বীন পালন করে। কারণ, আল্লাহ তাঁর দ্বীনের জন্য তাদের নির্বাচন করেছেন। তারা জানে এই পৃথিবী তাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। আর তারা সৃষ্টি হয়েছে একমাত্র আল্লাহর জন্য। তাই স্বাভাবিকভাবে তাদের চোখের মণিতে ফিরে ফিরে আসে আল্লাহর বাণী–

> 'বলে দিন, নিশ্চয় আমার নামাজ, কুরবানি, জীবন ও মৃত্যু একমাত্র বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহর জন্যই, তাঁর কোনো শরিক নেই...' সূরা আনআম : ১৬২-১৬৩

এই পার্থিব জীবনে মানুষের নানা আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা জাগে। কেউ সম্পদের নেশায় পাগল হয়, কেউ খ্যাতির মোহে বিভোর হয়, কেউ প্রতিপত্তির আশায় জীবন পার করে, কেউ নারীর প্রেমে হাবুডুবু খায়, আবার কেউ মদিরায় আবেশে হারিয়ে যায়, আবার কেউ-বা পড়ে ক্ষমতার লোভে। অথচ এরা এই প্রজন্ম, এই পৃথিবীতে কোনো নৈরাজ্য চায় না, চায় না কোনো সাম্রাজ্য। মর্যাদা ও প্রতিপত্তি এদের চাওয়া নয়। বিত্ত-বৈভব তাদের আকর্ষণ করতে পারে না। প্রবৃত্তি-পূজা তাদের মন-মগজে নেই। খ্যাতির পিছু তারা ছোটে না। তারা আল্লাহর কাছে দুআ করে, পৃথিবী যেন তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত না হয়। কিছুতেই যেন দুনিয়ার মোহ তাদের গ্রাস করতে না পারে। পৃথিবী যেন তাদের জীবনের পথ ও লক্ষ্যে পরিণত না হয়। কারণ, তাদের চিন্তাই হলো আখিরাত। তাদের লক্ষ্যই হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাদের কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত ব্যতীত সবকিছুই মরীচিকা! এই মাটির পৃথিবীর সবকিছুই তাদের কাছে ধূলির সমান।

একত্ববাদের সজীবতায় তাদের হৃদয় সিক্ত। তাই তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য রব খুঁজতে যায় না। আল্লাহই তাদের কাছে একমাত্র বিচারক, আল্লাহই তাদের একমাত্র অভিভাবক। জীবন থেকে সমস্ত প্রতিমাকে তারা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। নকল ও প্রতারক ইলাহের ভোজবাজি থেকে তারা মুক্ত। তাই তারা আল্লাহ ব্যতীত কারও কাছে মাথা নোয়ায় না। তেমনি তাদের হৃদয়জগৎ এবং মেধা ও মনন কারও কাছে বন্ধক দেয় না। তাদের মোনাজাতের মর্ম ও তাৎপর্য তারা জানে যখন তারা বলে–

> 'আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।' সূরা ফাতিহা : ০৫

এ কথা উচ্চারণ করার পরে তারা কিছুতেই আল্লাহর ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করতে পারে না। অন্য কারও কাছে সাহায্য চাইতে পারে না। তারা প্রবৃত্তির-পূজা এবং মনোবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত। আর মানুষ এই প্রবৃত্তির দাসত্বই বেশি করে। মনোবৃত্তিই তাদের গোলাম বানিয়ে ছাড়ে। পক্ষান্তরে এই প্রজন্ম আল্লাহর গোলামি ব্যতীত সব ধরনের গোলামি থেকে মুক্ত।

তারা প্রতিমার পূজা করে না। প্রবৃত্তির দাসত্ব, ব্যক্তির ও প্রকৃতির পূজা এবং কল্পনাপ্রসূত ধারণা ও বস্তুবাদিতার পূজা থেকে তারা মুক্ত। তারা কোনো ভ্রান্তি ও বাতিলের পূজা করে না; তার নাম ও চিত্র যা-ই হোক। তারা রাসূল মারফত নিজেদের স্বর ও আওয়াজ পেয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতের কুপ্রভাব থেকে বেঁচে থাকো।' সূরা নাহল : ৩৬

তারা সৎ পথ ও ভ্রান্ত পথের মাঝের তফাৎ জানে। তাই তাগুত ও বাতিলকে তারা অস্বীকার করেছে। আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। শক্ত ও সুদৃঢ় রজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছে, যে রজ্জুর কোথাও কোনো ছিদ্র নেই।

ইসলামি প্রজন্ম

বিজয়ী প্রজন্মের আলাদা কোনো বংশ, জাতীয়তা ও ঐতিহ্য নেই। তাদের একমাত্র পরিচয় তারা মুসলিম। তারা নামে কিংবা বংশগত পদবিতে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যে, পরিবেশের প্রভাবে, শিক্ষাগত যোগ্যতায়, রুচি ও আভিজাত্যের উন্নতিতে নিজেদের পরিচয় দেয় না। তারা সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামের প্রতি ঈমান আনে, আর গভীর জানাশোনার ওপর ভিত্তি করে জাহেলিয়াতকে বর্জন করে। তারা বেশ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে। ভ্রান্তি ও তাগুতকে অস্বীকার করে। তাদের কাছে ইসলামই একমাত্র দ্বীন। আল্লাহ প্রদত্ত আসমানি শরিয়াহই তাদের কাছে একমাত্র পথ ও পন্থা। আল্লাহর কিতাবই তাদের জীবনের সংবিধান। কারণ, তা আল্লাহই তাদের জন্য নির্বাচন করেছেন। কুরআন দিয়েই তাদের ওপর তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণতা দিয়েছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দিয়েছি এবং আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করেছি আর ইসলামকে দ্বীন হিসেবে নির্বাচন করেছি।' সূরা মায়েদা : ০৩

অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে–

> 'আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত কোনো ধর্ম অনুসন্ধান করতে যায়, আল্লাহর কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সেই ব্যক্তি আখিরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।' সূরা আলে ইমরান : ৮৫

কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

> 'যখন তাদের আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি আহ্বান করা হয়, যেন তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন অথবা তারা যেন বলে, আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। সূরা নূর : ৫১

যখন তাগুতের অপশক্তির দিকে তাদের আহ্বান করা হয়, তারা বলে– 'আমরা অস্বীকার করেছি এবং প্রত্যাখ্যান করেছি।' তারা দুনিয়ার কোনো তাগুতি শক্তির কাছে মাথা নত করে না। প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য কোনো কিছুই তাদের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত নয়। তারা আলো গ্রহণ করে কুরআনে বর্ণিত বরকতময় বৃক্ষ থেকে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> 'পূর্বেরও নয় পশ্চিমেরও নয়; তাঁর আলো জ্বলে উঠার উপক্রম হয়েছে– যদিও কোনো আগুন তাঁকে স্পর্শ করেনি। আলোর ওপর আলোর ঝলকানি। সূরা নুর : ৩৫

তারা পুঁজিবাদের নিপীড়ন মেনে নেয় না। সমাজতন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ট হয় না। ডান-বাম কোনো কিছুর প্রতি ঝুঁকে না। তাদের স্থান সর্বদাই মূল কেন্দ্রবিন্দুতে। তাদের অবস্থান হলো নানা দিকের মধ্যবর্তী স্থানে। তারা কোনো ব্যক্তি, শ্রেণি, দল, নিয়ম কিংবা শাসনব্যবস্থার স্বার্থে কাজ করে না। তারা একমাত্র ইসলামের স্বার্থে কাজ করে। তারা সমগ্র ইসলামি উম্মাহর দায়িত্ব গ্রহণ করে। একমাত্র তাঁর জন্যই তারা জীবন উৎসর্গ করে। আবার তাঁর কাছেই ফিরে যায়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল এবং মুমিনদের দায়িত্ব গ্রহণ করে, নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী।' সূরা মায়েদা : ৫৬

তারা একমাত্র আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক রাখে। ঈমানই তাদের গর্বের ধন। কুরআনই অহংকারের সামগ্রী। ইসলামই তাদের অবলম্বন। তাদের স্লোগান হলো যেমনটা কবি বলেছেন–

> 'ইসলামই আমার পিতা, এ ছাড়া আমার অন্য কোনো জনক নেই। তাই আমি বংশ-মর্যাদার মিথ্যা অহমিকায় ভুলি না।'

জিহাদি ও দাওয়াতি প্রজন্ম

বিজয়ী প্রজন্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জিহাদ ও দাওয়াত; যেমনটা ছিলেন মুহাজির ও আনসারি সাহাবারা। সেই মর্দে মুমিন সাহাবাদের আলোয় তারা পথ চলে। তাদের দেখেই এই প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হয়। আল্লাহর দ্বীনের জন্য তারা জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ ও মুমিনদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এক জিহাদ তাদের কিছুতেই অন্য জিহাদ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। এক ময়দানে গিয়ে অন্য ময়দানের কথা ভুলে যায় না। তারা সর্বদাই ভেতর-বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে অবিরাম লড়ে যায়। ভেতরের পাপাচারে লিপ্ত ও অনৈতিক কাজে জড়িত লোকের সঙ্গে একটা মৌন যুদ্ধে চলে, বাইরের কাফিরদের সাথে চলে সরাসরি ময়দানি মোকাবিলা। তারা কখনোই অস্ত্র ফেলে দেয় না। বিশ্রাম নেয় না। তাদের বিরামহীন সংগ্রাম চলে। সমগ্র পৃথিবী আল্লাহর দ্বীনের ছায়াতলে আসা পর্যন্ত তারা সংগ্রাম চালিয়ে যায়। আল্লাহ জমিনের সবটাই তাদের কাছে যুদ্ধের ময়দান। প্রত্যেক মুসলিম দেশই তাদের আপন ভূমি। হয়তো কোনো শ্যামল কান্তির আরবকে দেখবে আফগানিস্তানে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়ে যাচ্ছে। আবার কোনো পাকিস্তানিকে চোখে পড়বে ফিলিস্তিনে কিংবা লেবাননের ময়দানে ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। ইহুদি আগ্রাসনকে রুখে দেওয়াই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সব কুফরিই এক মতাদর্শ। অভিন্ন পথের পথিক। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

> 'যারা কুফরি করেছে তারা একে অপরের বন্ধু।' সূরা আনফাল : ৭৩
>
> 'আর মুমিন নারী ও পুরুষ একে অপরের বন্ধু।' সূরা তাওবা : ৭১

তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে যায়। খোদার রাহে যেকোনো যুদ্ধে তাদের সাড়া পাওয়া যায়। হাতে যা আছে তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কখনো কখনো শুধুই শূন্য হাতেই এগিয়ে যায়। সেই হাত দিয়েই কামান প্রতিহত করে। আবার কখনো ধন-সম্পদ নিয়ে এগিয়ে আসে। জিহাদের ময়দানে অর্থের প্রয়োজন মেটায়। আর অর্থের জোগানদাতা সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে–

> 'যে ব্যক্তি কোনো যোদ্ধাকে তার আনুষঙ্গিক প্রয়োজন পূরণ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দেয়, সেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার প্রতিদান পাবে।'

আর কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল নিয়ে যুদ্ধ করো।' সূরা তাওবা : ৪১

কখনো কখনো বাতিলকে রুখতে হবে সত্য ও বলিষ্ঠ কথা দিয়ে। যদি কোনো কথা বাতিলের মূলে কুঠারাঘাত করতে পারে, তাহলে সেখানে কথাই হবে জিহাদ। সে কথা কখনো লিখে কিংবা প্রচারমাধ্যমে বলে প্রচার করতে হবে। কেউ যদি তরবারি নিয়ে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে না পারে, তাহলে সে যেন কুরআন দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। আর সেটা বড়ো জিহাদ। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> 'কিছুতেই কাফিরদের আনুগত্য করো না। তাদের সাথে কুরআন নিয়ে বড়ো যুদ্ধে অবতীর্ণ হও।' সূরা ফুরকান : ৫২

তাদের কাছে দ্বীনই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। দ্বীনের পথে দুনিয়া অতি তুচ্ছ হয়ে পড়ে। আকিদা ও মতাদর্শই তাদের কাছে মূল্যবান। আর সেই দ্বীন ও দ্বীনি মতাদর্শের জন্য জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে দিতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। যখন কোনো ব্যক্তি নিজের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের মূল্য জানবে, তখন তার কাছে সেই পথে ব্যয় হওয়া জিনিস অতি তুচ্ছ হয়ে যায়! যে ব্যক্তি অনুপম সুন্দরীকে প্রস্তাব দেয়, সে কি মোহরের পরিমাণের কথা চিন্তা করে? আল্লাহ তাদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন। তারা শুধুই বিক্রি করে যায়। তাদের এবং তাদের প্রভুর মাঝে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। এই চুক্তিতে তারা কখনোই লজ্জিত হবে না।

আক্ষেপ ও পরিতাপের শিকার হবে না। আল্লাহ অধিক মূল্যে কিনেছে, তারা সন্তুষ্ট হয়েছে। নিজেদের মালিকানার সবটুকুই তারা উজাড় করে দিয়েছে। কেনই-বা দেবে না?

তাদের স্রষ্টাই তাদের জীবন কিনে নিয়েছে। তাদের রিজিকদাতাই তাদের সম্পদ কিনেছে। অতঃপর তিনি বললেন– 'তার বিনিময়স্বরূপ তোমরা গ্রহণ করো এমন জান্নাত, যার প্রস্থ হলো আসমান ও জমিন!' আর মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন–

> 'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের ধন-সম্পদ ও জীবনকে জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারপর তারা অবিরাম আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে যায়। কখনো তারা হত্যা করে, আবার কখনো নিজেরা হত্যার শিকার হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআনে তাঁর ব্যাপারে সত্য প্রতিশ্রুতি আছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে, তোমরা তাঁর সাথে যে বাইয়াত গ্রহণ করেছ, তার ব্যাপারে সুসংবাদ গ্রহণ করো। আর তা মহা বিজয়।' সূরা তাওবা : ১১১

এই ব্যবসায়ীরা সম্মানিত হয়েছে। তারা আশা করে, ব্যবসায় মুনাফা অর্জন করবে। তাদের ব্যাবসা ঈমান ও জিহাদের ব্যাবসা। তাদের বাজার যুদ্ধের ময়দান ও জিহাদের মুক্ত প্রান্তর। তাদের পুঁজি হলো জীবন ও সময়। তাদের মুনাফা হলো আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের নিশ্চয়তা– যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে।

যখনই জাহেলিয়াতকে জেগে উঠতে দেখে, শয়তান ছদ্মবেশে ফিরে আসে, তখনই তাদের হৃদয় ঈমানি চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আল্লাহর ইজ্জত ও মান রক্ষায় তাদের আত্মমর্যাদাবোধ জ্বলে ওঠে। যেমনটা আগুনের ওপর কড়াই তপ্ত হয়ে উঠে ঠিক তেমনই। বরং তাদের হৃদয় আক্ষেপ ও পরিতাপে গলে যায়। অনেকটা লবণ যেমন পানিতে গলে যায় ঠিক তেমনই। বাতিল এগিয়ে আসবে আর সত্য ও সঠিক দ্বীন থেকে সরে যাবে– এর চেয়ে ব্যথাতুর ও কষ্টকর মুমিনের জন্য আর কী হতে পারে! বাতিলের ভ্রান্ত স্বর উচ্চকিত হবে, যার ফলে সত্যের অবিনাশী বাণী ক্ষীণ হয়ে আসবে– এটা কি মুমিন-হৃদয় মেনে নিতে পারে?

অন্যরা দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন পার করতে পারে। কারণ, তারা আত্মচিন্তায় মগ্ন, ব্যক্তিস্বার্থে বিভোর। কিন্তু এই প্রজন্ম তো সকাল পার করে উম্মাহর চিন্তায় আর বিকাল কাটায় উম্মাহর স্বার্থে। উম্মাহর দুরাবস্থা দেখে কষ্টে তাদের বুক ভেঙে যায়। উম্মাহর কঠিন মুহূর্তে দুশ্চিন্তায় তাদের কপালে ভাঁজ পড়ে।

তাদের সর্বপ্রথম চিন্তা হলো দ্বীন এবং দ্বীনের কল্যাণ। আর সর্বশেষ চিন্তা হলো দুনিয়া। তাদের সবাই বলে– 'আমার জাতি।' তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে বলে– 'আমি! আমি!' তাদের কাছে সবচেয়ে উত্তম চিন্তা হলো, নির্লিপ্ত উদাসীন পথহারা ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা; সে যেন আল্লাহর পথে ফিরে আসে, তওবা করে– সেই প্রচেষ্টা চালানো।

তাদের সব সময়ের ধ্যান-জ্ঞান হলো পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত ব্যক্তিদের খোদার পথে নিয়ে আসা। তারা যেন ইসলামের পথে, সৎপথ পেয়ে ফিরে আসতে পারে, তারা সব সময় সেই চেষ্টাই করে যায়। যারা কুরআন চর্চার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, কুরআন লালনকারীদের ওপর তেড়ে আসে, তাদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা এবং প্রতিহত করাই এই প্রজন্মের অন্যতম কাজ। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'ওই ব্যক্তির চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং সৎ কাজ করে আর বলে– আমি একজন মুসলিম?' সূরা ফুসসিলাত : ৩৩

মানব সমাজে দরবেশ

টগবগে হৃদয়, উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিরামহীন জিহাদ নিয়ে বিজয়ী প্রজন্ম মানুষের ভিড়ে বাস করে দরবেশের মতো। এমনকী তারা আপন বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব এবং নিকটাত্মীয়দের মাঝে বাস করলেও। নিজের বাড়িতে তো অপরিচিত কেউ নেই। সমস্ত চেহারা পরিচিত। মানুষের মুখের ভাষা পরিচিত। চলন-বলন পরিচিত। কিন্তু একটা দূরত্ব আছে; চিন্তা ও ভাবনার দূরত্ব। দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের দূরত্ব। চারপাশের সমস্ত মানুষ বাস করছে একবিংশ শতাব্দীতে, একবিংশ শতাব্দীর চিন্তা-চেতনা নিয়ে। আর তারা একবিংশ শতাব্দীর বাসিন্দা হয়েও চিন্তা ও চেতনা লালন করছে হিজরির প্রথম শতাব্দীর। তাদের চারপাশের সমস্ত মানুষ তাকায় আশপাশের মানুষের চেহারার দিকে, অনুসরণ করে আশপাশের মানুষদের। অথচ তারা তাকায় সাহাবাদের চেহারার দিকে, অনুসরণ করে তাঁদের উজ্জ্বল আদর্শকে। ফলে খুব সহজেই তাদের কাছে এই পরিবেশ অচেনা মনে হয়। তাদের কাছে চারপাশের অসংখ্য মানুষকে অচেনা লাগে। মনে হয় সব মুখ অচেনা, এই পরিবেশ অচেনা! তারা একাকিত্ববোধ করে। তাদের চোখ-মুখজুড়ে অসহায়ত্বের ছাপ! এই দরবেশ ও অচেনা মানুষদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক!

এই একাকিত্ব ও অপরিচিত ভাব তাদের কুণ্ঠিত করে না, হতাশাগ্রস্ত করে না। প্রথাগত দরবেশের মতো নিভৃতে সাধনা করতে বসে যায় না তারা। নিজেকে পরিণত করে না জনবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিতে। যেমনটা খ্রিষ্টানদের বৈরাগ্যবাদীরা করে কিংবা জাহেলি যুগে সাত্ত্বিক পুরুষরা করত। অথচ এই প্রজন্মের কাছে বৈরাগ্য হলো জিহাদ। কৃচ্ছতার চর্চা হলো

'মিল্লাতে ইবরাহিমের' (ইবরাহিমের ধর্মের) প্রতি মানুষকে ডেকে যাওয়া। তাই তারা যুদ্ধ-প্রান্তরে দৃঢ় অবিচল থাকে। বিপদের মুখে ধৈর্যশীল, অনড় থাকে। অবিরাম পথ চলে। মানুষ যখন কম করতে চায়, তখন তারা প্রচেষ্টা বাড়িয়ে দেয়। মানুষ যখন নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তখন তারা সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হয়।

এরা এমন এক প্রজন্ম, যারা বিপ্লবকে বাস্তবে রূপ দেয়। স্বচ্ছতা ও পরিশুদ্ধির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। উপমার জন্ম দেয়। যুদ্ধের ডাক দিলে সবার আগে থাকে, অথচ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নেওয়ার ক্ষেত্রে থাকে সবার পেছনে! কিন্তু সচেতনতায় এবং দানের অগ্রগামিতায় সবার চেয়ে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও কোনো সুউচ্চ মিনারায় বাস করে না তারা। সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে না। অহংকার করে না। অন্যের ওপর ছড়ি ঘোরায় না। প্রভাব খাটায় না। বরং সমগ্র জাতির সাথে একযোগে কাজ করে। সাধারণ মুসলমানদের মতো জীবন পার করে দেয়। জাতির চিন্তা ও কষ্ট নিজ কাঁধে বহন করে। সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে। সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে। হাসি-কান্না, অসহায়তা ও স্বপ্ন পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করে।

মর্যাদাবান ও শক্তিশালী প্রজন্ম

বিজয়ী প্রজন্ম যদিও নিজের জাতি ও যুগের কাছে অপরিচিত, কিন্তু তারা শক্তিশালী ও সম্মানিত। সংখ্যার স্বল্পতা তাদের ভীত করে না। ধ্বংস ও বিনাশকামীদের আধিক্য দুর্বল করতে পারে না তাদের। নাকের ঘ্রাণশক্তি তাদের অতি প্রবল। আর শিরদাঁড়া শক্ত ও ঋজু। তাদের হৃদয় অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য। তারা দৃঢ়তা ও উচ্চতায় পাহাড়কে হার মানায়। তাদের দীপ্তি ও উচ্চতার কাছে তারকারাজি লজ্জা পেয়ে যায়। তারা ক্ষুধার জ্বালায় মরে যেতে পারে, কিন্তু কিছুতেই কারও কাছে হাত পাতবে না। প্রয়োজনে জীবন দেবে, কিন্তু কিছুতেই কারও কাছে মাথা নত করবে না। তারা সম্পদশালী এবং ক্ষমতাধরদের প্রতি তাকায়; ডাক্তার যেমন রোগী ও পীড়িত ব্যক্তিদের মতো করুণাভরে। তারা কিছুতেই তাদের ভয় পায় না। তাদের মহান ও অভিজাত ভাবে না; বরং তাদের জন্য ভয় করে। কারণ, তারা পিঠের ওপর বয়ে চলেছে এক বিশাল বোঝা। তাদের হৃদয় দখল করে আছে এক মহামারি। তারা পুঞ্জিভূত স্বর্ণের খনিকে মনে করে তামার পাত, তার চেয়ে বেশি কিছু মনে করে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'জাহান্নামে আগুনে তার ওপর সেক দেওয়া হবে। ফলে তাদের কপাল, পাশ এবং পিঠ পুড়ে কুঞ্চিত হয়ে যাবে। আর এগুলো হলো তা-ই, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে।' সূরা তাওবা : ৩৫

তাদের শক্তি হলো সত্যের শক্তি, সে দিকে তারা অবিরাম ডেকে যায়। তাদের সম্মান হলো আল্লাহর সম্মান, যার প্রতি তারা ঈমান এনেছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'যে ব্যক্তি ইজ্জত চায়, সে যেন জেনে রাখে সমস্ত ইজ্জত ও সম্মান হলো আল্লাহর জন্য।' সূরা ফাতির : ১০

তারা আল্লাহর আলো দিয়ে দেখে। কথা বলে নববি ভাষায়। কুদরতি হাত দিয়ে আক্রমণ করে। কোনো হুংকার ও ধমকি তাদের পরাভূত করতে পারে না। কোনো হুমকিদাতা তাদের দুর্বল করতে পারে না। তারা এমন এক স্বর্ণখণ্ড, যা আগুন গলাতে পারে না। লোহার তীব্র আঘাতও তাদের ফুঁটো করতে পারে না। তারা আল্লাহর সহায়তায় সৎ পথে চলে। পথভ্রষ্ট হয় না। আপন দ্বীনকে নিয়ে গর্ব করে, কিছুতেই হীনম্মন্যতায় ভোগে না। আপন শক্তিতেই তারা বিজয়ী হয়, কেউ তাদের পরাজিত করতে পারে না। তারা অজেয়। আল্লাহর কাছেই তারা সাহায্য প্রার্থনা করে, দারিদ্র তাদের মনোবল ভাঙতে পারে না। তারা সমস্বরে গেয়ে ওঠে–

'আমি বেঁচে থাকলে খাদ্যের পরোয়া করি না।
মরে গেলে কবরের স্থানের চিন্তায় মগ্ন নই।
আমার মনোবল হলো বাদশাদের মতো।
আর হৃদয় হলো স্বাধীন ব্যক্তির মতো অবাধ,
তাই লাঞ্ছনা মেনে নিতে পারে না।
যখন সামান্য আহারে জীবন করেছি সাঙ্গ,
তখন এসব রহিম-করিমকে ভয় করতে যাব কেন?'

তারা এমন প্রজন্ম; যাদের ভয়াবহ বিপদও টলাতে পারে না। তাদের হৃদয়ের তপ্ত আগুন নেভাতে পারে না। তাদের দেদীপ্যমান জ্যোতি নিষ্প্রভ করতে পারে না। ধৈর্যচ্যুত করতে পারে না। মনোবল ভাঙতে পারে না। স্বপ্ন ভোলাতে পারে না; বরং বিপদ তাদের আরও উদ্যমী ও উচ্ছল করে। নিজেদের অবস্থান যাচাই করতে সুযোগ দেয়। নিজেকে বিচারের সম্মুখীন করার দুর্লভ সুযোগ এনে দেয়। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সাজাতে সুযোগ এনে দেয়। তারা কিছুতেই দুর্বল হয়ে পড়ে না। মচকে যায় না। তাদের কাছে আদর্শ ওইসব ব্যক্তিবর্গ; যাদের কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> 'কত নবিই যুদ্ধ করেছে, আর তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করেছে অনেক খোদাভীরু ব্যক্তি। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে যে আক্রমণের শিকার তারা হয়েছে, তাতে তাঁরা দুর্বল হয়নি। মচকে যায়নি। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন। তাদের কথা হলো– "হে আমাদের রব! আমাদের পাপসমূহ এবং আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন। আমাদের কদমকে মজবুত ও সুদৃঢ় করুন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দান করুন।" আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরুস্কার দান করেছেন। আর আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।' সূরা আলে ইমরান : ১৪৬–১৪৮

এভাবেই তারা বিপদ উতরে যায়। বিপদ কিছুতেই তাদের দমাতে পারে না; বরং তারা দুঃসময়কে সাদরে বরণ করে নেয়। দুঃসময় তাদের ভগ্ন-হৃদয় করতে পারে না এবং একসময় তারা দুঃসময় কাটিয়ে পবিত্র ও পরিপক্ব হয়ে ওঠে। আরও বিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ হয়ে পড়ে। যেমনটা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

> 'যে মুমিনকে বিপদ আক্রান্ত করে, সে হলো ওই লোহার মতো যা আগুনে পোড়ানো হয়। তারপর তার খাদ চলে যায় আর লোহা হয়ে সম্পূর্ণ নিখাদ, নিরেট ও খাঁটি।'

যারা বড়ো বড়ো লোকের গর্দান উড়িয়ে দেবে, যে বড়ো বড়ো প্রতাপশালীকে দুর্বল ও পর্যুদস্ত করে ছাড়বে, তারা কিছুতেই আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। তারা কিয়ামতের দিনকে ভয় করে, যে দিনের ভয়াবহতায় হৃদয় উলটে যাবে, চোখ বিস্ফোরিত হবে। সুতরাং তাদের হৃদয়ের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানে ভয় কিছুতেই ঢুকতে পারে না। ঠিক তেমনিভাবে মনের দরজাকে বন্ধ করে দিয়েছে, তাই সেখানে লোভ ঢুকতে পারে না। তাদের লোভ হয় কেবল আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের, যার প্রস্থ হলো আকাশ ও জমিনের সমান! তারা জীবনের ভয়ে কাতর নয়। কারণ, তা নির্ধারিত। রিজিকের চিন্তায় অসহায় নয়। কারণ, তা নিপুণভাবে বণ্টিত!

কোনো প্রতাপশালী অহংকারী শাসক তাদের দমাতে পারে না, মাথা নোয়াতে পারে না। এমনকী তাদের পিঠের ওপর উপর্যুপরি বেত্রাঘাত করা হলেও!

গলিত পুঁজ ও কাঁটাযুক্ত গাছ খেতে দিলেও! কোনো অত্যাচারী নিপীড়ক হয়তো তাদের পিঠের ওপর করায়ত্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কিন্তু কিছুতেই তাদের হৃদয়জগৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাদের শরীরের ওপর হুকুম চলবে, কিন্তু কিছুতেই অন্তর শাসন করতে পারবে না। তারা খোলসের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারলেও, মুক্তোর নাগাল পায় না।

তারা হয়তো শরীরকে অবশ করতে পারে, বন্দি করতে পারে, কিন্তু মনোজগৎকে কী করে বন্দি করবে! সে ক্ষমতা কি অত্যাচারী নিপীড়কদের আছে? যখন নব্য ফেরাউন তাদের হত্যার বা শূলিতে চড়ানোর হুমকি দেয়, তারা তার উদ্দেশ্য তা-ই বলে, যা জাদুকররা ঈমান আনার সময় ফেরাউনকে বলেছিল–

> 'তোমরা যা ইচ্ছা করো, তুমি সর্বোচ্চ এই নশ্বর পৃথিবীর জীবনকে শেষ করে দিতে পারবে।' সূরা ত্বহা : ৭২

অত্যাচারী নিপীড়ক শত্রু তাদের কী আর এমন বিপদে ফেলবে? বিপদ তো তাদের কাছে পরিশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধির নিছক এক মাধ্যম। স্বর্ণ যেমন আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়ে ওঠে, তেমনি তারাও বিপদের ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে শক্ত ও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। বিপদ তাদের ঈমানের দীপ্তি বাড়িয়ে দেয়। অন্তর্লোক স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করে দেয়; আগুন যেমন স্বর্ণের প্রভা ও বিভা বাড়িয়ে দেয়!

একজন ভ্রান্ত অত্যাচারী নিপীড়ক মুমিনের কি এমন ক্ষতি করতে পারে? তারা তো স্বীয় আকিদা ও মতাদর্শের জন্য শাস্তি মাথা পেতে নেয়, জীবন দিতে পারে। সবকিছুর পরও তারা ইসলামের দাওয়াত চালিয়ে যায়। নির্বাসন তাদের কাছে আল্লাহর পথে হিজরত। কারাগার তো আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য নির্জন স্থান। হত্যা তো আল্লাহর পথে শাহাদাত!

ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থি প্রজন্ম

বিজয়ী প্রজন্ম যেমন দৃঢ় অবিচল ও আত্মমর্যাদাশীল, তেমনি ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থি। তারা সঠিক ও সরল পথে চলে। একেবারে ডানে ঝুঁকে পড়ে না, আবার বাম দিকেও বিচ্যুত হয় না। একেবারে বস্তুবাদী যেমন হয় না, তেমনি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা-নির্ভরও হয়ে পড়ে না। প্রান্তিকতা তাদের স্পর্শ করে না। তারা জানে যে তাদের রবের যেমন হক আছে, তেমনি নিজেদের দেহেরও হক আছে। পরিবারের যেমন হক আছে, তেমনি সমাজেরও তার ওপর হক আছে। তারা প্রত্যেক হকদারকে তার হক পরিপূর্ণরূপে দিয়ে দেয়। হক আদায়ে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি যেমন করে না, তেমনি ছাড়াছাড়িও করে না। তারা ওজনে বেশিও দেয় না, কমও দেয় না; বরং সঠিকরূপে মেপে দেয়। বিন্দু পরিমাণও কম দেয় না।

তাঁরা গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে। সুযোগ কিছুতেই নষ্ট করে না। আল্লাহ সুযোগ কাজে লাগানোকে যেমন পছন্দ করেন, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ সময়কে কাজে লাগানোকেও পছন্দ করেন। তারা মানুষকে আশার কথা শোনায়, কিছুতেই হতাশ করে না। ঘৃণার চর্চা করে না। যেকোনো কিছু সহজভাবে দেখে। কঠিন করে ফেলে না। কুরআন তাদের শেখায় যে নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার জন্য সহজতা কামনা করে, কাঠিন্য নয়। আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের মাঝে কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি রাখেননি। তারা কোমল আচরণের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করে। কিছুতেই কঠোরতা অবলম্বন করে না। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে ডাকে, কিছুতেই বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার পথে হাঁটে না। উত্তম উপায়ে তর্ক করে। তারা চোখের মণিতে রাখে কুরআনের বাণী–

> 'তোমার প্রভুর রাস্তায় মানুষকে সদুপদেশ আর প্রজ্ঞার সাথে ডাকো এবং তাদের সাথে উত্তম উপায়ে তর্ক করো।' সূরা নাহল : ১২৫

তারা পাপাচারীদের দেখে, যেমনটা ডাক্তার রোগীকে দেখে। পুলিশি দৃষ্টিতে দেখে না। কখনোই কোনো পাপাচারীকে কাফির বলতে যায় না, পাছে সে মুরতাদ হয়ে যায়! তারা কখনোই বলে না, মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্যদের অপবাদ দিতে যায় না। নিজেদের ভালো ও উত্তম বলে দাবি করে না। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

> 'যে ব্যক্তি বলে মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, সে তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট ও ধ্বংস!' মুসলিম

তারা আপন দ্বীন ও ধর্ম নিয়ে খুবই আত্মমর্যাদাশীল। তারা নিজেদের বিরোধীদের সাথে উদারনৈতিক আচরণ করে। কোনো প্রকার ঘরানাপ্রীতি তাদের পেয়ে বসে না। কোনো প্রকার হঠকারিতা ছাড়াই তাঁরা নিজেদের বক্তব্য পেশ করে যায়। তাদের কাছে নিজেদের মতামত বিশুদ্ধ মনে হলেও নির্ভুল মনে করে না; তাদের মনে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তাদের দৃষ্টিতে অন্যদের মতামত ভুল হলেও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনার কথা ভাবে। ভাবে, কে জানে হয়তো নিজেদের মতামতই ভুল! তাদের কাজই হলো গবেষণা করা, নতুন চিন্তা নিয়ে আসা। এর জন্য প্রতিদান পাবে তারা, তা ভুল হোক কিংবা শুদ্ধ।

তারা মূল ও শাখা উভয়ের মাঝে তফাত করে। মূল বিধান রক্ষায় তারা লোহার মতো কঠিন, কিন্তু শাখাগত বিধান রক্ষায় ও পালনে তারা রেশমি কাপড়ের মতো কোমল। তারা কাজ এবং তার বিধানের স্তরের মাঝে পার্থক্য করে চলে। তাদের কাছে কিছু নির্দেশনা আছে, কিছু নিষেধাজ্ঞাও আছে। প্রত্যেক কাজের নিজস্ব স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরের নিজস্ব বিধান রয়েছে। যেটা ফরজ সেটা মুস্তাহাব নয়। আর যেটা হারাম সেটা মাকরুহ নয়। আর যা কবিরা গুনাহ, তা কিছুতেই ছগিরা গুনাহ হতে পারে না। কোনো বিধান তর্কাতীত ওয়াজিব কিংবা হারাম। আবার কোনো বিধানের ব্যাপারে তর্ক আছে। কোনো বিধান অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে। আবার কোনো বিধান তুলনামূলক কম শক্তিশালী দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত। এই প্রজন্ম কিন্তু এই সব ব্যাপারে কথা বলতে যায় না; বরং তারা আলিমদের কাছ থেকে জেনে নেয়। বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হয়।

প্রত্যেক বিষয়েই বিশেষজ্ঞ রয়েছে। প্রত্যেক শিল্পেরই নিজস্ব ব্যক্তি রয়েছে। কুরআনে সে দিকে ইঙ্গিত করে বর্ণিত হয়েছে–

> 'বিজ্ঞ ব্যক্তির মতো করে কেউ-ই বলতে পারে না।' সূরা ফাতির : ১৪

অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে–

> 'তার ব্যাপারে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হও।' সূরা ফুরকান : ৫৯

আরও ইরশাদ হয়েছে–

> 'যদি তোমরা না জানো, তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে নাও।'
> সূরা নাহল : ৪৩

এই জন্যই তারা ক্ষুদ্র স্বার্থে নাক গলাতে গিয়ে কিছুতেই বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয় না। ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে মেতে উঠে কিছুতেই চূড়ান্ত পরিণতির কথা ভুলে যায় না। তারা কুতর্কে জড়িয়ে, ভুল ও ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়ে কিংবা মশার রক্ত ইত্যাদি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কিছুতেই নিজেদের শক্তি ও সময় নষ্ট করে না। হোসাইনের রক্ত নিয়ে মাত করে না। তারা কাজ নিয়ে পড়ে থাকে, তর্কের পেছনে ছোটে না। গড়ে তোলাই তাদের ধ্যান-জ্ঞান, গুঁড়িয়ে দেওয়া নয়। একতা ও ঐক্যই তাদের কাজ, বিচ্ছিন্ন ও বিভাজন করা নয়। তাদের স্লোগানই হলো– আমরা একমত হওয়া বিষয়ে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা করব। ভিন্নমত পোষণ করা বিষয়ে তর্কে জড়াব না; বরং তা থেকে দূরে থাকব।

তারা দুনিয়া এবং আখিরাতের মাঝে তুলনা করে চলে। প্রত্যেকেই প্রত্যেক হক ও অধিকার আদায় করে দেয়। তারা দুনিয়া থেকে দূরে সরে যায় না। নির্জনপুরিতে কিংবা মঠবাসীদের মতো সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয় না। কৃপণ ও নির্বিকার ব্যক্তিদের মতো আচরণ করে না।

তারা অজ্ঞদের মতো করে বলে না–

> 'হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতেই দিয়ে দাও। আর আখিরাতে তাদের কোনো অংশ নেই।' সূরা বাকারা : ২০০

বরং তারা মুমিনদের মতোই বলে–

> 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পৃথিবীতে ও আখিরাতে উভয় জায়গাতেই কল্যাণ দাও, আর জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।' সূরা বাকারা : ৩০১

তারা নিজেদের জন্য নবিজির মতো দুআ করে–

> 'হে আল্লাহ! আমার দ্বীন ঠিক করে দিন, আর তাতেই আমার রক্ষা। আমার দুনিয়া ঠিক করে দিন এবং তা-ই আমার জীবন। আমার আখিরাত ঠিক করে দিন। কারণ, সেটাই আমার প্রত্যাবর্তনস্থল।'

তারা শরীরের সৌন্দর্যের পিছু পড়ে আত্মার স্বচ্ছতা ও পরিশুদ্ধির কথা ভুলে যায় না। আবার আত্মার পরিশুদ্ধির পিছু পড়ে স্বাস্থ্যেরও অবহেলা করে না। তারা বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিকতার মাঝে সমন্বয় সাধন করে চলে। দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে ভারসাম্য রেখেই চলে। কল্পনা ও বাস্তবতা, ঈমান ও জ্ঞান সবকিছু মিলিয়ে তাদের জীবন। বুদ্ধিদীপ্ত মন ও স্বচ্ছ হৃদয়, লক্ষ্যপানে অবিচল থাকা এবং পথ ও পদ্ধতির উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনই তাদের আরাধ্য। তারা অধিকার আদায়ে যেমন সোচ্চার, তেমনি দায়িত্ব পালনেও সতর্ক। পুরোনো ও প্রাচীন ব্যাপার যেমন তাদের কাতর করে, তেমনি নতুনও হাতছানি দেয়। তারা অতীত যেমন ভোলে না, তেমনি বর্তমানও বিস্মৃত হয় না। অতীতের কল্যাণ গ্রহণ করতে তারা পিছপা যেমন হয় না, তেমনি অধুনা সময়ের সুবিধা গ্রহণেও দ্বিধা করে না।

তারা অন্যের কাছে নিজের অধিকার দাবি করার আগে নিজের দায়িত্ব পালনে উদ্গ্রীব থাকে। তাদের চিন্তার ব্যাপার হলো– 'আমার দায়িত্ব কী?' তবে 'কী আমার অধিকার' —এটা তাদের তেমন ব্যাকুল করে না।

তাদের দিন কাটে কর্মঠ কর্মীর বেশে, আর রাত কাটে জিকিরে মশগুল থেকে। তারা দিনে জিহাদের ময়দানে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটায়, আর রাতে সম্পূর্ণ সাধক পুরুষের মতোই ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়ে। ঠিক সাহাবাদের বর্ণনা যেমন এসেছে তেমনি। এই প্রজন্ম তাদের অনুসরণ করে চলে। দিনের ক্লান্তি কিছুতেই রাতের কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। আবার রাতের অনিদ্রা দিনের কাজে প্রতিবন্ধক হয় না। কোনো ফরজ আদায় করতে গিয়ে অন্য ফরজ ছেড়ে দেয় না।

তারা আল্লাহ প্রদত্ত উত্তম ও উপাদেয় রিজিক উপভোগ করতে দ্বিধা করে না। আল্লাহর পথে ঘুরে বেড়ায়, তাঁরই অনুগ্রহ খুঁজে বেড়ায়। অথচ তাদের কেউ কেউ ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে দিন কাটিয়ে দেয়, তবুও অন্যের কাছে হাত পাতে না। কিছুতেই হারাম দ্রব্যের দিকে তাদের চোখ যায় না। তাদের মন হারাম জিনিস কামনা করে না। তারা এতটাই বোকা নয় যে হারাম লোকমা কিংবা প্রবৃত্তির পূজা করতে গিয়ে জাহান্নাম কিনে নেবে! মশার ডানার মূল্যের পৃথিবী কিনতে গিয়ে তারা কিছুতেই অমূল্য জান্নাত বিকিয়ে দেয় না!

তাওবায় সমর্পিত প্রজন্ম

এত সবকিছুর পরও তারা তওবার প্রতি গুরুত্বশীল। আল্লাহর নাফরমানি করতে যায় না। আল্লাহ তায়ালার এবং মুমিনদের শত্রু থেকে সতর্ক থাকার চেয়ে পাপাচার থেকে বেশি সতর্ক থাকে। তারা সদা আল্লাহর কাছে দুআ করে–

> 'হে আল্লাহ! আমাদের হালাল কাজের তাওফিক দাও, হারাম কাজ থেকে বিরত রাখো। তোমার আনুগত্যের তাওফিক দাও।'

তারা মনে করে– অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পাপ থেকে অন্তরের পাপ বেশি ভয়ানক, হৃদয়ের মাঝে কুপ্রভাব ফেলে। অন্তরের পাপাচার হলো অহংকার ও গর্ব করা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও মোহাবিষ্ট হওয়া, লৌকিকতা ও প্রদর্শনেচ্ছা, মানুষের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা, হিংসা ও বিদ্বেষ লালন করা; এমন আরও নানাবিধ পাপাচার– যার বর্ণনা কুরআন ও হাদিসে এসেছে। ইমাম গাজালি সেগুলোর নাম দিয়েছে 'মুহলিকাত' তথা বিনাশকারী পাপাচার। আর এই প্রকারের পাপ রোজার প্রাণ নষ্ট করে দেয়, তাহাজ্জুদের প্রভাব দূর করে দেয়। আগুন যেভাবে কাঠ পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে, ঠিক তেমনি অন্তরের পাপ মানুষের ভালো কাজ নষ্ট করে ফেলে।

এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য হাদিসের একটা সতর্কবাণী যথেষ্ট। হাদিসে বলা হয়েছে–

> 'যে ব্যক্তির মাঝে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে, সে কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' মুসলিম

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

> 'বিন্দু পরিমাণ অহংকারও শিরক।'

আর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

> 'তোমাদের শিরা-উপশিরায় পূর্ববর্তী জাতিদের রোগ ঢুকে পড়েছে। আর তা হলো– হিংসা ও বিদ্বেষ। বিদ্বেষ হলো কর্তনকারী। আমি বলছি না চুল কেটে ফেলে; বরং দ্বীন কেটে ফেলে।'

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা খারাপ ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় কিছু খারাপ ধারণা অপরাধ।' সূরা হুজুরাত : ১২

অপরাধের ক্ষেত্রে এই হলো তাদের অবস্থান। তারা পাপাচারকে ভয় পায়। পাপাচারের নাগপাশ ঘেঁষেও তারা হাঁটে না। পাপের দরজা থেকে নিজেদের দূরে রাখে। পাপাচারের পথ বন্ধ করে, যেন কিছুতেই কোনো গুনাহ হয়ে না যায়। ফিতনার মুখোমুখি না হয়। সংশয় থেকে বেঁচে থাকা যায়। আর যে ব্যক্তি সংশয় থেকে দূরে থাকবে, তার দ্বীন ও সম্মান নিরাপদ থাকবে।

এতদ্সত্ত্বেও তারা তো মানুষ। আদমের বংশধর; যার ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> 'ইতঃপূর্বে আমি আদমের কাছে নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু সে ভুলে গেছে, সংকল্পে তাঁকে দৃঢ় পাইনি।' সূরা ত্বহা : ১১৫

তারা পবিত্র ফেরেশতা নয়, নিষ্কলুষ নবিও নয়। তারাও সাধারণ আদম সন্তান, পাপপ্রবণ। কিন্তু যখনই তারা মাটির আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়, তখনই আল্লাহর কাছে তওবা করে। তাঁর নিকট ফিরে যায়। মুত্তাকিদের মতোই। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'যখনই শয়তানের কোনো দল তাদের কুমন্ত্রণা দেয়, তখনই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের চোখ খুলে যায়।' সূরা আ'রাফ : ২০১

তারা আল্লাহকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কখনো ভুলে যায় না। কুরআনে বলা হয়েছে–

> 'হে আদম সন্তান! তোমরা শয়তানের উপাসনা করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু। তোমরা আমারই ইবাদত করো। আর এটাই সরল-সঠিক পথ।' সূরা ইয়াসিন : ৬০-৬১

তারা সর্বদা স্মরণ করে, তাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামত এবং প্রতিশ্রুতির কথা। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'আমরা শুনেছি এবং অনুসরণ করেছি।' সূরা নূর : ৫১

তারা আল্লাহর সাথে করা প্রতিশ্রুতি, তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং কিয়ামতের দিনের হিসাবের কথা স্মরণ করে। তারপর তাদের কাছে অস্পষ্ট জিনিসগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। চলার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

যদি কখনো হৃদয়ের স্বচ্ছতার ওপর মাটির আস্তরণ পড়ে যায়, প্রবৃত্তির তাড়নার কাছে যদি দ্বীনি চেতনা হেরে যায়, তবুও তারা শয়তান ও তার দলের কাছে নতি স্বীকার করে না। বরং তাদের মা-বাবা আদম-হাওয়ার মতোই বলে ওঠে–

> 'হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন, আমাদের ওপর দয়া না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব।' সূরা আরাফ : ২৩

এই হলো তাদের বৈশিষ্ট্য। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'যখন তারা কোনো গর্হিত কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের ওপর অত্যাচার করে, সাথে সাথে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তারপর নিজেদের পাপাচারের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে ক্ষমা করতে পারে? তারা জেনে-বুঝে আর পাপের পুনরাবৃত্তি করে না।' সূরা আলে ইমরান : ১৩৫

তারা সর্বদা তাদের প্রতি আল্লাহর অন্তহীন নিয়ামত ও দয়ার দিকে তাকায়। নিজেদের অসম্পূর্ণ আমলের দিকে তাকায়, যা খোদার কাছে পৌঁছে। তারা তো আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী। তাঁর রহমত ব্যতীত তারা অসহায়। তাই আল্লাহর হক আদায়ের ক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতার কথা তারা বুঝতে পারে।

নিজেদের কমজোরি তারা উপলব্ধি করতে পারে। তারা ইউনুস (আ.)-এর মতোই ডাক দিয়ে ওঠে–

> 'আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত।' সূরা আম্বিয়া : ৮৭

তারা সর্বদাই তওবা করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের ভাষা ধার করে আল্লাহকে ডাকে–

> 'হে আমাদের প্রভু! আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি ডাকতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো। তারপর আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ ক্ষমা করে দিন, আমাদের খারাপ কাজগুলো মুছে দিন এবং উত্তম মানুষদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করুন।' সূরা আলে ইমরান : ১৯৩

প্রত্যাশিত প্রজন্ম

এমন একটি প্রজন্মের আশায় আমরা বসে আছি। এই প্রজন্মের দিকে চেয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে গোটা উম্মাহ! এই প্রজন্ম গড়ার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এই প্রজন্মের তরেই আমরা হৃদয়ের সলতে জ্বালিয়ে রেখেছি।

এই প্রজন্মকেই নির্মূল করে দিতে ইসলামবিরোধী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা এই প্রজন্মকে জন্ম নেওয়ার আগেই মেরে ফেলতে চায়। যদি জন্ম হয়ে যায়, তাহলে জীবন্ত পুঁতে ফেলতে চায়। আর যদি কোনোটাই না পারে, তাহলে তাকে আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলিয়ে দেয়। তার জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দেয়। কিছু অলীক ব্যাপারকে তার জীবনের মূল লক্ষ্য বানিয়ে দেয়। যুদ্ধের মূল প্রান্তর থেকে সরিয়ে দেয়। ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে তার জীবনের চাকা। তার পথচলায় ব্যাঘাত ঘটায়। পথে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখে। নিজেদের মাঝে ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রাখে। নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে ব্যস্ত রাখে। আরও নানা কাজে তাদের সময় নষ্ট করে। আর মূল কাজের ব্যাপারে তারা থাকে সম্পূর্ণ বেখবর!

বর্তমান ইসলামি আন্দোলনগুলোর প্রথম কাজ হলো এই প্রজন্মকে গড়ে তোলা। ইসলামি চিন্তাবিদ, দায়ি এবং আলিমদের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো এই প্রজন্মকে পরিপূর্ণরূপে গড়ে তোলা। শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, চারিত্রিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎসহ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলা। তাদের প্রথমে অভ্যন্তরীণ আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তারপর শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত করা!

এই প্রজন্মই আবু বকর (রা)-এর সেই ঈমানি চেতনাকে লালন করবে এবং জিইয়ে রাখবে, যা রিদ্দার যুদ্ধে মুরতাদদের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠেছিল। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মাঝে যারা ধর্মচ্যুত হবে, আল্লাহ অচিরেই এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবে; যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহও তাঁদের ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও সদয় হবে, আর কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর ও নির্দয়। তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দা শুনবে না। আর এটা আল্লাহর অনুগ্রহ– যাকে চান তাকে দেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রাচুর্যময়।' সূরা মায়িদা : ৫৪

এই প্রত্যাশিত প্রজন্মই বিজয়ী প্রজন্ম– বিজয়ী কাফেলা। তাদের হাত ধরেই ফিলিস্তিন উদ্ধার হবে। আফগানিস্তান ও ইরিত্রিয়া স্বাধীনতা ফিরে পাবে। ফিলিপাইন, বোখারা ও সমরখন্দ শত্রুর করতলমুক্ত হবে।

এই প্রজন্মের হাত ধরে আবারও আল্লাহর নামখচিত পতাকা পৃথিবীর বুকে উড্ডীন হবে। আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়বে। আসমানি আলোতে দুনিয়ার অন্ধকার কেটে যাবে।

এই প্রজন্মই আল্লাহর সাহায্য ও মদদ পাওয়ার উপযুক্ত। এদের কাতারেই আসমান থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে। আল্লাহর সাহায্যের করতলগত হবে গোটা পৃথিবী। এমনকী এক পর্যায়ে পাথর, গাছ পর্যন্ত বলে উঠবে–

'হে আব্দুল্লাহ! ওহে মুসলিম! এইতো তোমার শত্রু আমার পেছনে লুকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি এসো, একে হত্যা করো।'

সুতরাং আজকের নবীন মুসলিম তরুণদের ডাক দিয়ে যাই, তারা যেন এই দুর্বলতা ও শূন্যতার সময়কে শক্তি ও পূর্ণতায় ভরে দেয়। আল্লাহওয়ালা সেই প্রত্যাশিত প্রজন্মের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেয়। আল্লাহর অনুগ্রহে তার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। প্রতিটা মুসলিম দেশে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সত্যবাদী সংস্কারকদের অমানুষিক কষ্ট বৃথা যাবে না–

> 'আর আল্লাহ তাদের ঈমানকে নষ্ট করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল।' সূরা বাকারা : ১৪৩

আর যে ব্যক্তি নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকতে চায় কিংবা নির্বিকার ও নির্লিপ্ত ব্যক্তিদের মাঝে নিজেকে লুকাতে চায়, সে নিজের ধ্বংস ও বিনাশ ডেকে আনবে। খোদার ক্রোধ ও গজব তার ওপর নেমে আসবে। শত্রুরা খুশি হবে। তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন ভোগ করেছে, মাদকতাভরা যৌবনের নেশায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে কিন্তু কোনো ফলপ্রসূ কাজ করতে পারেনি, তার জীবনের কি সার্থকতা আছে? তার জীবন তো এক ধু ধু বালুচর। বিশুষ্ক বালিয়াড়ি প্রান্তর। কোথাও কোনো উদ্ভিদ নেই। নেই কোনো সবুজের ছোঁয়া, প্রাণের স্পর্শ।

এই উম্মাহর ক্ষয় নেই

প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে গাঁথা আছে উম্মাহর চেতনা। তাদের চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসজুড়ে আছে 'মুসলিম উম্মাহ' নামক এই ভ্রাতৃত্বময় চেতনার অস্তিত্ব; অন্তরের গভীরে খুদিত আছে উম্মাহর পবিত্র নাম।

এটাই সেই জাতি– মুসলিম উম্মাহ যার নাম। এই জাতিসত্তা নিয়ে তারা গর্ববোধ করে, পরিচয় দেয়। এই জাতির মান রক্ষায় ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে জীবনবাজি রাখে, জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইসলামের শ্বাশত চেতনায় উদ্দীপ্ত এই জাতি; এই মুসলিম উম্মাহ।

এটাই একমাত্র জাতি, যা এক রবের প্রতি বিশ্বাস করে ঈমান আনে। তিনি হলেন মহান আল্লাহ। এক কিতাবের প্রতি ঈমান আনে। সেই কিতাব হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি তারা ঈমান আনে। প্রতিদিন পাঁচবার তারা কিবলামুখী হয়। আর মুসলমানদের কিবলা কাবা, পবিত্র হারাম শরিফ।

এই উম্মাহ হতে এসে মিশেছে শত সম্প্রদায়, নানা গোত্র। নানা অঞ্চল ও ভূখণ্ডের বিচিত্র সব মানুষ। এরপরও তারা এক জাতি। আকিদা ও মতাদর্শ তাদের এক কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে; বিভেদের সব দেয়াল তুলে দিয়েছে। খোদায়ি বিধান তাদের একই সুতোয় গেঁথে দিয়েছে। রুচি-অভিরুচি, চিন্তা-চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে এনেছে এক অভূতপূর্ব মিল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি মূল্যবোধ ও শিষ্টাচারের মিশেল ঘটিয়েছে। তাদের ইতিহাস এক। বিজয়ের আনন্দ যেমন এক, তেমনি পরাজয়ের গ্লানিও অভিন্ন। তাদের স্বপ্ন এক এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনাও এক। বর্তমানের গ্লানিতে ভরা অবস্থা দেখে তাদের ব্যথাতুর হৃদয় কেঁপে ওঠে।

তাই কিছুতেই 'মুসলিম জাতিসমূহ' বলা সমীচীন হবে না। বরং বলা উচিত ইসলামি সম্প্রদায়। এক উম্মাহ, অভিন্ন জাতি। যেমনটা কুরআনে আল্লাহ বলেছেন–

> 'আর তোমাদের এই জাতি এক ও অভিন্ন জাতি। আমি তোমাদের প্রভু সুতরাং আমাকে ভয় করো।' সূরা মুমিনুন : ৫২

এই উম্মাহ–
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এক...
চিন্তা ও চেতনায় এক...

এই উম্মাহ –
বোধ ও বিশ্বাসে এক ...
অনুভব ও অনুভূতিতে এক...

রাসূল ﷺ এই উম্মাহর ঐক্য ও মৈত্রীর উপমা দিয়েছেন মানবদেহের সঙ্গে। মানবদেহের কোনো অঙ্গ যদি আক্রান্ত হয়, গোটা শরীরে তার প্রভাব পড়ে, প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তেমনি মুসলিম উম্মাহর কোনো অংশ যদি আক্রান্ত হয়, গোটা মুসলিম বিশ্ব সে আঘাতে ব্যথাতুর হয়ে ওঠে, উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

এই উম্মাহ আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা নিয়েই স্বাতন্ত্র্য সত্তায় রূপ নিয়েছে। এই উম্মাহর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এই উম্মাহ খোদায়ি উম্মাহ!

এই উম্মাহ অন্য জাতির মতো কাকতালীয়ভাবে সৃষ্ট হওয়া কোনো জাতি নয়। এরা কোনো বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসী নয়। কোনো নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী নয়। কোনো বিশেষ ব্যক্তি, দল কিংবা শ্রেণির ইচ্ছায় কিংবা কোনো নির্বাচিত পরিষদের ইচ্ছায় অথবা কোনো বিদ্রোহী দলের মদদে এই উম্মাহ সৃষ্টি হয়নি। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় এই উম্মাহর সৃষ্টি। পৃথিবীতে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব পালনের তরে এই উম্মাহর সৃষ্টি। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'আর এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যমপন্থি উম্মাহ করেছি।' সূরা বাকারা : ১৪৩

আল্লাহই এই জাতিকে মধ্যমপন্থি ভারসাম্যপূর্ণ মতের অধিকারী এক জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মাঝে যেন তারা আপন ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে।

অনন্য গুণাবলি

বিজয়ী উম্মাহর অন্যতম গুণাবলি হলো, এই উম্মাহ মধ্যমপন্থি উম্মাহ; যেমনটা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। সবকিছুতেই এই উম্মাহ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে। বিশ্বাস ও মতাদর্শে, জিকির ও ইবাদতে, মূল্যবোধ ও চরিত্রে, আমল ও কাজে, জীবনাচার ও পথচলায়, শরিয়ত ও বিধিবিধানে, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে, অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সম্পর্কে ভারসাম্য ও মধ্যমপন্থা মেনে চলে। বিষয় ও সম্পদের মোহে পড়ে হৃদয় ও আত্মাকে অবহেলা করে না। আবার হৃদয় ও আত্মার সমৃদ্ধিতে মনোযোগ দিয়ে বিষয়-সম্পদকেও তুচ্ছ করে না। কোনো ব্যক্তিকে এত বড়ো করে দেখে না যে সে সমাজের ওপর চড়ে বসবে। আবার সমাজকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় না যে ব্যক্তিকে অবহেলা করবে। প্রত্যেককেই আপন আপন অধিকার যেমন দেয়, তেমনি আপন আপন দায়িত্ব ও কর্তব্যও বুঝিয়ে দেয়। কোনো প্রকার সীমালঙ্ঘন করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

> 'তোমরা পাল্লায় মেপে দেওয়ার সময় অবাধ্য হবে না। সৎভাবে পাল্লায় ওজন দাও। কিছুতেই কম করবে না।' সূরা রহমান : ৮-৯

এই জাতি আন্তর্জাতিক বার্তা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল কিংবা বিশেষ জাতির জন্য প্রেরিত হয়নি; বরং গোটা মানবতার শিক্ষকরূপে আবির্ভূত হয়েছে। সমস্ত মানবের পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরিত হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> 'আর এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যমপন্থি উম্মাহ করেছি, যেন তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য।' সূরা বাকারা : ১৪৩

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

> 'তোমরা সর্বোত্তম উম্মাহ, মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। সূরা আলে ইমরান : ১১০

এই উম্মাহ বন-বাদাড়ে জন্ম নেওয়া আগাছার মতো পথে-ঘাটে একা একা জন্ম নেয়নি। প্রকৃতির খামখেয়ালিতে জন্ম নেওয়া কোনো জাতি নয়, যেমনটা অনেকে মনে করে থাকে; বরং এই জাতির একজন স্রষ্টা আছে, তিনি হলেন মহান আল্লাহ। তিনি এই জাতিকে সৃষ্টি করেছেন নিজের মাঝে কুণ্ঠিত হয়ে থাকার জন্য নয়। আপন সীমা ও গণ্ডির ভেতরে বাস করার জন্য নয়। কেবল আপন বৈষয়িক লাভের জন্যও নয়; বরং সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য এই জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আরব-অনারব, সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন সবার জন্যই, সবার কল্যাণের জন্যই এই উম্মাহর সৃষ্টি। সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্যই প্রেরিত হয়েছে এই উম্মাহ; যেমনটা আল কুরআন সমগ্র পৃথিবীর হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এই উম্মাতের আবির্ভাব রহমত ও দয়ার আবির্ভাব, কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার নয়।

রাসূল ﷺ আপন উম্মাহকে সম্বোধন করে বলেছেন–

> 'তোমরা সহজকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছ, কঠিনকারী হিসেবে নয়।'

সাহাবারা এই হাদিসের মর্ম ও তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। তারা বুঝেছিলেন, সমগ্র উম্মাহর হিদায়াতের জন্যই তাঁদের আবির্ভাব হয়েছে। আর সেই কথা ফুটে উঠেছে তাঁদের একজনের বক্তব্যে, তিনি হলেন রবয়ি ইবনে আমের (রা.)। তিনি পারস্য সেনাপতি রুস্তমের সামনে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে ভাবাবেগপূর্ণ ভাষায় এই উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন–

'আল্লাহ আমাদের প্রেরণ করেছেন মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে বের করে প্রশস্ততার পথ দেখানোর জন্য এবং নানা ধর্মের অনাচার থেকে ইসলামের সুবিচারের পথে আনার জন্য।'

চিরস্থায়ী উম্মাহ

বিজয়ী উম্মাহর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এই উম্মাহ চিরস্থায়ী ও অবিনাশী। কারণ, তাদের কিতাব ও বার্তা চিরস্থায়ী। যতদিন পৃথিবীতে রাত-দিনের পরিবর্তন থাকবে, ততদিন এই উম্মাহ দুনিয়ার বুকে টিকে থাকবে। যতদিন কুরআনের তিলাওয়াত থাকবে, ততদিন এই জাতির অস্তিত্বও টিকে থাকবে। যদি আল্লাহর সংরক্ষণে কুরআন টিকে থাকে, তাহলে কুরআনের উম্মাহও কুরআনের সাথে বেঁচে থাকবে।

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের কাছে কথা দিয়েছেন, তাঁর উম্মতকে কখনোই তিনি একবারে সমূলে ধ্বংস করবেন না, যেমনটা পূর্বের অনেক জাতিকে ধ্বংস করেছেন। কুদরতি শাস্তি, নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়; যেমন তুফান, প্লাবণ, দমকা বায়ু ইত্যাদি দিয়ে শেষ করে দেবেন না।

আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিছুতেই নবিজির ﷺ-এর উম্মতের ওপর বাইরের শত্রুদের চড়াও করবেন না, যারা তাদের মূলে কুঠারাঘাত করবে; সমূলে ধ্বংস ও বিনাশ করে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগবে। তবে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। একে অপরের ধ্বংস কামনা করবে।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁর উম্মতকে বাহ্যিক ধ্বংস থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ধ্বংস থেকেও রক্ষা করবেন। আর অভ্যন্তরীণ ধ্বংস হলো পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহির ওপর সবাইকে একত্রিত করা। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

> 'আল্লাহ আমার উম্মতকে পথভ্রষ্টতার ওপর একত্রিত করবেন না।'

তার মূল কারণ হলো, এই উম্মাহ সর্বশেষ উম্মাহ। এই উম্মাহর নবিও শেষ নবি। আর কিতাব হলো শেষ কিতাব। মুহাম্মদ ﷺ-এর পরে আর কোনো রাসূল আসবে না। কুরআনের পরে কোনো আসমানি কিতাব আসবে না। ইসলামের পরে অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা আসবে না। ইসলামি উম্মাহর পরে আর কোনো উম্মাহ এই পৃথিবীতে আসবে না।

ইসলামপূর্ব যুগে কোনো উম্মতের সবাই যদি পথভ্রষ্টতার ওপর একত্রিত হতো, তাহলে তা গোটা মানবতার জন্য বড়ো কোনো বিপদ ছিল না। কারণ, ওই উম্মত ছিল নির্ধারিত সময় ও নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিস্তৃত। ইসলামি উম্মাহ তেমন নয়। এই উম্মাহ সর্বজনীন। এর বিস্তৃতি গোটা বিশ্বে। স্থান ও কালের সীমা পেরিয়ে এই দাওয়াত সামগ্রিক ও সর্বকালের দাওয়াতে পরিণত হয়েছে। প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে সব জায়গায় এর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে।

তাই এই উম্মাহর সবাই যদি পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হয়ে যায়, তাহলে গোটা শরিয়াহই গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তখন মানুষকে সৎ পথে ডাকার কেউ থাকবে না, সমগ্র উম্মত বিপথে চলে যাবে।

খোদায়ি বিধানই হলো, এই জাতির মাঝে সব সময় এমন একটা দল থাকবে, যারা সৎ পথের ওপর অবিচল থাকবে এবং সৎ পথের ওপর অটল থেকেই মৃত্যুবরণ করবে। এই দল নুহ (আ.)-এর কিস্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। এরাই হলো সঠিক পথের সেনানী। এই দলই উম্মাহর ভারসাম্য ঠিক রাখবে, ধসে পড়তে দেবে না। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> 'আর আমার সৃষ্টির মাঝে এমন একটা দল রয়েছে, যারা সততার সাথে সৎ পথের দিকে আহ্বান করবে এবং সততার সাথে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে।' সূরা আ'রাফ : ১৮১

রাসূল ﷺ বলেছেন–

> 'আমার উম্মাহর মাঝে একটা দল থাকবে, যারা সর্বদাই সত্যের ওপর অটুট থাকবে। তাদের বিরোধীরা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। আর শেষ পর্যন্ত এই অবস্থার ওপরই কিয়ামত হবে।'

এই দলই হলো সমস্ত পথিকের আলোকবর্তিকা, উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের পথের দিশা, অসহায় দুর্বল মানুষের ভরসা। এরা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকে যায়। মানুষের কাছে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেয়। তারা আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে মাথা নত করে না।

বিপথগামী মানুষকে সৎ পথে নিয়ে আসে এরা। মানুষ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে সংশোধন করে দেয়। এরাই হলো ধ্বংসশীল মানুষের ত্রাতা, মুক্তিকামী দল। এরা সৎ পথের ওপর সদা অবিচল ও স্থির। এরা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত সঠিক ইসলামকেই পুনর্জীবন দেবে। মানুষের প্রতি খোদায়ি রহমতের বড়ো নিদর্শন হলো আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল এমন দল মানুষের মাঝে টিকিয়ে রাখা। এই দলের মাধ্যমে অজ্ঞরা জ্ঞানী হবে। বিপথে যাওয়া লোকগুলো সৎ পথে ফিরে আসবে। অচেতন হয়ে পড়ে থাকা মানুষ চৈতন্য ফিরে পাবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'যদি এরা আপনার নবুয়ত অস্বীকার করে, তবে এর জন্য এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না।' সূরা আনআম : ৮৯

আল্লাহ আহমদ শাওকির ওপর রহম করুন। তিনি কী চমৎকার কথা বলেছেন–

> 'যে মহান সত্তা 'আলকামা'-কে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কোনো প্রজন্মকেই এমন প্রতিভা থেকে বঞ্চিত করেননি।'

এই জাতির স্থায়িত্ব ও টিকে থাকার বড়ো প্রমাণ হলো, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালের মুসিবত এই জাতিকে নস্যাৎ করে দিতে পারবে না, পারবে না শেষ করে দিতে; বরং প্রতিটা বিপদ তাদের নতুন করে উজ্জীবিত করে তোলে। প্রতিরোধ ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার প্রণোদনা জোগায়। তাই যখনই কোনো বিপদ এই জাতিকে আক্রান্ত করে, তখন তারা আরও শক্তিশালী ও মজবুত হয়ে ওঠে। হয়ে উঠে দৃঢ় মনোবল ও ইস্পাত-কঠিন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী।

চারপাশ থেকে ধেয়ে আসা বিপদের ঘনঘটা দেখে অনেকে ভাবে, এবার বোধহয় এই জাতির শেষ রক্ষা হবে না। পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যাবে,

কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যায়, এই দুর্বলতা ও অসহায়তা স্বল্প সময়ের ব্যাপার মাত্র! ধীরে ধীরে অসহায়তা কেটে যায়। দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। তাকে ঘিরে থাকা হতাশার মেঘ কেটে যায়। আর এই জাতির ভেতরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে। দ্বীনের প্রাণ ফিরে আসে। দ্বীনের ছায়াতলে এসে পরাজয়ের গ্লানি মুছে যায়। বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ঐক্য ও মৈত্রী ফিরে আসে। বিচ্ছিন্নতা ও অন্তর্মুখিতার জায়গায় সংঘবদ্ধতা চলে আসে। স্থবিরতা ও নিশ্চল অবস্থা কেটে যায়। প্রাণচাঞ্চল্য ও সজীবতা ফিরে আসে।

ইতিহাসে এমন উদাহরণের অভাব নেই। এখানে কয়েকটা ঘটনা তুলে ধরলাম–

১. ইসলামের একেবারে উষালগ্নে রিদ্দার যুদ্ধে এবং জাকাত প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানানো অবাধ্য লোকদের সাথে যুদ্ধের ক্ষেত্রে আমরা এই দৃশ্য দেখতে পাই।

২. এই চিত্র দেখেছি তাতারিদের আক্রমণের সময়। যখন মুসলিম সালতানাত ধ্বংস হয়ে পড়ছিল, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, প্রাচ্য থেকে ধেয়ে আসা তাতারিদের আগ্রাসী অগ্রযাত্রা রোধ করে দাঁড়িয়েছিল মুসলিম বিশ্ব। অথচ তাদের দানবীয় গতি দেখে মনে হয়েছিল যেন ইয়াজুজ-মাজুজ ধেয়ে আসছে! বাতাসের তীব্র ঝাপটা লন্ডভন্ড করে দেবে সবকিছুই! কুরআনের বর্ণিত আয়াতেই যেন তাদের আগ্রাসনের চিত্র ফুটে উঠেছিল। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> 'যেখানেই সে আঘাত হানে, সেটাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছাড়ে।'
> সূরা জারিয়াত : ৪২

৩. ক্রুসেডের যুদ্ধেও আমরা এই দৃশ্য দেখেছি। পাশ্চাত্য থেকে ধেয়ে আসা তিত্ববাদের মুখোমুখি হয়েছিল মুসলিম বিশ্ব। এই ক্রুসেডের যুদ্ধ মুসলিম বিশ্বে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, কিন্তু বিনাশ করতে পারেনি। বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, কিন্তু শেষ করে দিতে পারেনি। মুসলিম বিশ্ব তাদের প্রতিহত করেছে, ঘুরে দাঁড়িয়েছে– ইতিহাসের পাঠকমাত্রই ইতিহাসের এই ঘটনা জানে। তারপর মুসলিম উম্মাহর সুপ্ত শক্তি জেগে উঠে এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হিত্তিনের ঐতিহাসিক যুদ্ধে ক্রুসেডারদের কোমর ভেঙে দেয়। বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করে নেয়।

প্রায় নব্বই বছর পরে ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত হয় ইসলামের প্রথম কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাস! একইসঙ্গে ফ্রান্সের রাজা নবম লুইসকে গ্রেফতার করে।

মানুষ তাতারিদের অপরাজেয় শক্তি মনে করত। মুসলমানরা 'আইনে জালুতের' যুদ্ধে সেই তাতারিদের গুঁড়িয়ে দেয়। তাতারিদের পরাজয় দেখে মানুষ বলতে লাগল– 'তাতারিদের পরাজয় কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না!'

কিছুদিন আগেও আমরা মুসলিম দেশগুলোতে উপনিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই দেখেছি, প্রতিরোধ দেখেছি। ফ্রান্সের উপনিবেশের বিরুদ্ধে মহান নেতা আব্দুল কাদের জাজায়েরির অবিরাম সংগ্রাম দেখেছি। স্পেনীয় উপনিবেশের বিরুদ্ধে আব্দুর করিম কিতাবির সংগ্রামের কথা আমাদের মনে আছে। ইতালীয়দের বিরুদ্ধে মহান বীর ওমর মুখতারের সংগ্রামের কথা কারও কাছেই অজানা নয়। ইংরেজ এবং ইহুদিদের বিরুদ্ধে ইজ্জুদ্দিন কাসসামের অবিরাম লড়ে যাওয়ার ইতিহাস কারও কাছে অবিদিত নয়। ফ্রান্সের উপনিবেশের বিরুদ্ধে জাজায়েরের মুক্তি-সংগ্রাম থেকে শুরু করে ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের স্বাধিকার আন্দোলন– প্রত্যেকটি যুদ্ধেই মুসলমানদের হারানো শক্তি ফিরে পাওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির জাগরণ

বর্তমান সময়ে আমরা ইসলামের জাগরণ দেখছি। মুসলিম উম্মাহর ঘোর অচেতন ভাব কেটে যাচ্ছে। আফগানিস্তানে জিহাদ দেখেছি। ইরিত্রিয়া ও ফিলিপাইনে প্রতিরোধ দেখেছি। ফিলিস্তিনে নিবেদিত প্রাণ মানুষের কাজ দেখেছি। মিশর, তুরস্ক এবং সিরিয়াতে জাগরণ দেখেছি। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে শিক্ষিত তরুণরা দলে দলে ইসলামের দিকে ঝুঁকছে। তারা সব ধরনের ফিতনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। মুমিনের শক্তি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই ঘটনাগুলো থেকে মুসলিম উম্মাহর স্থায়িত্ব বোঝা যায়। শক্তিমত্তা ও দৃঢ়তার পরিচয় ফুটে ওঠে। দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মুসলমানদের প্রতিরোধ-সক্ষমতা বোঝা যায়।

ভিনদেশি প্রাচ্যবিদরা মুসলিমদের এই গোপন শক্তির কথা ভালো করেই জানে। ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের কথা জানে। এই উম্মাহর আত্মশক্তির উৎস জানে। এজন্য তারা হাজার রকমের হিসাব কষে; বরং তারা মুসলিমদের ভয় করে চলে। প্রফেসর জেব তার বই *ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি*-তে উল্লেখ করেন—

> 'ইসলামি আন্দোলন বিদ্যুৎ গতিতে বিকাশ লাভ করে। এর বিকাশ দেখে অনেক সময় অবাক হতে হয়। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই এই আন্দোলন বিশাল বিস্ফোরণ ঘটায়। আর ইসলামি আন্দোলন পূর্ণতা পায় যখন সালাহুদ্দিনের মতো নেতৃত্ব সামনে এসে দাঁড়ায়।'

জার্মান পর্যটক 'বুল আসমিদ' এই বিষয়ে একটা বই লিখেছেন। তিনি তার বইয়ের নাম দিয়েছেন, *ভবিষ্যতের পরাশক্তি ইসলাম*। তিনি সেই বইয়ে বলেছেন–

ইসলামি প্রাচ্যের শক্তির মূল উৎস হলো তিনটি–

১. ইসলাম ধর্ম। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। সাংস্কৃতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও পারস্পরিক মিল।

২. ইসলামি ভূখণ্ডে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য। এই ভূখণ্ড পশ্চিম দিকে মরক্কো থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পূর্ব দিকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই প্রাকৃতিক সম্পদ বিরাট স্বনির্ভর অর্থনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে সক্ষম। যদি মুসলিম দেশগুলো পরস্পর এক হয়, তাহলে তাদের কোনো কিছুর জন্যই ইউরোপের কাছে হাত পাতা লাগবে না।

৩. সর্বশেষ কারণ হলো মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। সংখ্যায় অধিক হওয়াতে তারা অন্যদের ওপর সহজেই বিজয় লাভ করতে পারে।

তারপর তিনি বলেন, যদি উপরোক্ত তিনটি ব্যাপার মুসলিম সমাজে আবার ফিরে আসে, খোদায়ি বিধান ও আকিদা হৃদয়ে মনেপ্রাণে ধারণ করে সবাই যদি এক হয়ে যায় এবং নিজেদের সম্পদ দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারে, তাহলে মুসলিম বিশ্বের, বিশ্ব নেতৃত্বে আসা সময়ের ব্যাপার মাত্র! সমগ্র ইউরোপের জন্য তখন মুসলিম বিশ্ব হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

বুল আসমিদ তারপর মুসলিম ঐক্য ও মৈত্রীর কথা উল্লেখ করেন। তাদের মতাদর্শ এবং মতাদর্শপরায়ণতার কথা উল্লেখ করেন। ইতিহাসে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের কথা এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রয়াস ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার অজেয় কৌশলের কথা বর্ণনা করেন। এই মহাশক্তিকে রুখে দিতে খ্রিষ্টান-দুনিয়াকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। নতুন ক্রুসেড পরিচালনার পরামর্শ দিয়েছেন। যুগোপযোগী কৌশল এবং নতুনরূপে নব সাজে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

রবার্ট বেন তার বিখ্যাত বই *পবিত্র তরবারি*-তে বলেন– 'আমাদের উচিত আরবদের সম্পর্কে পড়াশোনা ও গবেষণা করা। তাদের চিন্তা ও চেতনা সম্পর্কে ধারণা নেওয়া। কারণ, পূর্বে তারা দুনিয়া শাসন করেছে। ভবিষ্যতেও তারা বিশ্ব নেতৃত্বে আসীন হতে পারে। মুহাম্মাদ ﷺ যে চেতনার আগুন তাদের মাঝে জ্বালিয়েছেন, আজও তা তাদের মাঝে বিদ্যমান আছে। এই চেতনা অবিনাশী, চিরায়ত।'

এই দুই প্রাচ্যবিদের কথায় বিষ আছে। আছে মুসলিম বিশ্বের প্রতি ঘৃণা ও হিংসা। তারপরও মুসলিমদের ব্যাপারে তাদের ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। মুসলমি শক্তির উৎস এবং তার বিস্তৃতি সম্পর্কে তারা জানে। মুসলমানদের ঐক্যকে তারা ভয় পায়। তারা এই অবিনাশী উম্মাহকে বিনাশ করার পায়তারা করে। কিন্তু এই জাতি চিরঞ্জীব! কারণ, এই জাতি বহন করে চলেছে অবিনাশী বার্তা কুরআনুল কারিম!

বোধের উদ্বোধন এবং জ্ঞানের উদ্ভাস

যুবসমাজের মাঝে পাঠস্পৃহা ও জ্ঞানপিপাসা জাগানোর পাশাপাশি ইসলামি চিন্তা ও বোধের উন্মেষ ঘটাতে হবে। আর এই পাঠ-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বুঝতে, রীতিনীতি ধরতে যুবসমাজের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। তাদের রুচি-অভিরুচি ও মন-মেজাজ বুঝতে হবে। পাঠের ধরন এবং প্রকৃতি, জানার প্রতি কৌতূহল ও উদ্দীপনার ব্যাপারে ধারণা রাখতে হবে। ইসলামি কোন চিন্তানায়ক তাদের প্রভাবিত করছে, কার প্রতি তারা ঝুঁকছে, কার কথা শুনতে তাদের মাঝে ব্যাকুলতাঘেরা প্রতীক্ষা দেখা যায় ও কার সাথে সাক্ষাতে তারা প্রীত হয় আর কার মজলিসে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, এন্তার সব বিষয়ের খোঁজখবর রাখা চাই। তবেই তাদের বোঝা যাবে, তাদের মনের অজানা কথা ধরা যাবে!

আর জ্ঞানের পিপাসা ও চিন্তার জগতে টোকা দেওয়ার এই কাজ করতে হবে পরিচিত ঢংয়ে, চেনাজানা কৌশলে। তা হলো– যুবসমাজের মাঝে ইসলামবিষয়ক নানা বই-পুস্তিকা ছড়িয়ে দেওয়া। মনে রাখতে হবে, এই কাজের পথ মসৃণ নয়। নানা বাধা আসতে পারে। শত বাধা উপেক্ষা করে ও হাজারো কাঁটা পায়ে দলে এই কাজ করতে হবে। আঞ্চলিক প্রতিকূলতা কিছুতেই যেন সামনে এসে দাঁড়াতে না পারে। দেশের আনাচে-কানাচে ইসলামি বই ছড়িয়ে দিতে হবে। এক পর্যায়ে ইসলামি বই হয়ে উঠবে 'বেস্টসেলার বুক'। বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও গণনায় তার স্থান হয়ে যাবে সবার ওপরে। বইমেলা শেষে দেখা যাবে, ইসলামি বই-ই মাসজুড়ে বিক্রিত বইয়ের মাঝে বেস্টসেলার!

তরুণ সমাজের মাঝে ইসলামি ভাবধারা জাগিয়ে তোলার আরও পদ্ধতি আছে। তার একটি হলো, ভিনদেশি ভাষায় লেখা ইসলামি বইগুলোর যথার্থ অনুবাদ। বিশেষ করে আরবি ভাষায় লিখিত বইগুলো। কারণ, আরবি হলো ইসলামি তাহজিব-তমদ্দুনের মূল উৎস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূতিকাগার। তাই এই প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষায় লেখা বইগুলো অন্যান্য মুসলিম ভাষাভাষী অঞ্চলের ভাষায় অনুবাদ করা। যেমন : উর্দু, তুর্কি, মালয়, সাওয়াহিলি, বাংলা ইত্যাদি। যেমনটা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদির বইগুলো উর্দু থেকে আরবিতে এবং অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সেই সঙ্গে ইউরোপিয়ান ভাষা যেমন : ইংরেজি, ফরাশি, স্প্যানিশ, ল্যাটিন ইত্যাদিতেও অনুবাদ করা।

আর হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে এই পাঠ-আন্দোলনে হয়তো কিছুটা ঘাটতি ও অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে। যেমন, এই পাঠ-বিপ্লবের কোনো কোনো ঘরানা আছে, যারা নির্দিষ্ট বলয় ও গণ্ডির বই পাঠে অভ্যস্ত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কেউ কেউ নির্দিষ্ট একটা ঘরানার চিন্তা-চেতনাকে লালন করে। কিছুতেই তার বলয় ও গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। তাই এরা কিছুতেই সমগ্র বিপ্লব ও আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করে না। তারপরও তারা অন্তত সেই মিথ্যা দাবির অসারতা প্রমাণ করেছে যে 'মুসলিম উম্মাহ পড়াশোনা করে না।' 'পাঠে চরম অনীহা' ☒ এসব ভিত্তিহীন উদ্দেশ্যমূলক উক্তির মূলে কুঠারাঘাত করেছে!

হৃদয়ের বন্দরে ঈমানি বিপ্লবের দাবানল

ঈমানি বিপ্লব হৃদয়ের মোড় বদলে দেয়। অনুভূতি ও উপলব্ধির দুয়ারে আঘাত হানে। এই বিপ্লবের আঁচ লাগে যুবসমাজের মাঝে। রাতারাতি এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দেয়। ধর্মীয় চেতনা ও ইসলামি ভাবধারা তাদের মাঝে উপচে পড়ে। আল্লাহর জিকির ও স্মরণে তাদের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। খোদার ভয়ে শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কুরআনের আয়াত তিলাওয়াতে লোমকূপ দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহ এবং রাসূলের ভালোবাসায় মন গলে যায়। মুমিনদের প্রতি প্রেম ও সহৃদয়তায় হৃদয় কেঁপে ওঠে। আবার অন্যদিকে শয়তান ও তার প্রেতাত্মাদের প্রতি ঘৃণায় মন বিষিয়ে ওঠে। পাপাচার ও তার নটরাজদের দেখে মন কলুষিত হয়!

এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই! কারণ, ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় ও মজবুত ভিত্তিই হলো আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা এবং আল্লাহর খাতিরেই ঘৃণা করা। বন্ধুত্ব হবে আল্লাহ তায়ালার নিমিত্তে। শত্রুতাও জন্ম নেবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী মুমিনদের বর্ণনা দিয়ে বলেন–

> 'আর নিশ্চয় মুমিন হলো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহর কথা আলোচিত হলে ভীত হয়ে পড়ে, কুরআনের তিলাওয়াত করা হলে ঈমান বেড়ে যায় এবং তাদের প্রতিপালকের ওপরই তারা নির্ভর করে।' সূরা আনফাল : ০২

অন্য আয়াতে বলেছেন–

> 'আল্লাহ উত্তম কথাসংবলিত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা সাদৃশ্যপূর্ণ এবং বারবার পাঠ করা হয়। আর এতে যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে, তাদের দেহ শিউরে ওঠে। অতঃপর, তাদের দেহ-মন নম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে।' সূরা জুমার : ২৩

ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাঙ্ক্ষিত সৈন্যদলের বর্ণনা দিয়েছেন, যারা ষড়যন্ত্রকারীদের মুখে ধোঁয়া দিয়ে ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। তিনি বলেন–

> 'হে মুমিনগণ! তোমাদের মাঝে যে স্বীয় দ্বীন ত্যাগ করে (সে যেন জেনে রাখে), আল্লাহ অচিরেই এমন এক জাতি নিয়ে আসবেন, যে জাতিকে তিনি ভালোবাসবেন এবং ওই জাতিও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনের প্রতি সহৃদয়তাপূর্ণ আচরণ করবে আর কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর হবে। তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় পায় না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তাকে দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।' সূরা মায়েদা : ৫৪

এই আয়াতের মাধ্যমেই এই বিপ্লবীদের অন্তরের স্বচ্ছতার পাশাপাশি মস্তিষ্কের উর্বরতার সংবাদ আমরা পাই। অগ্নিঝরা চেতনার পাশাপাশি গভীর পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নের খোঁজও পাই।

তারপরও আমাদের ঈমানি চেতনার মান ও পরিমাণ নিয়ে তর্ক আছে। সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ আছে। এক সর্বগ্রাসী জড়তা ও নিঃসাড় অবস্থা মুসলিম উম্মাহকে গ্রাস করেছে। কোথাও কোনো প্রাণ নেই, জীবনের ছোঁয়া নেই। ফলে ইসলামের ওপর আরোপ করা সাধারণ বিষয়গুলোর জবাব দেওয়ার কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। মুসলিম উম্মাহকে ঘিরে ধরেছে শত-সহস্র বিপদ, যা তাকে করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আর এই বিপদ মোকাবিলায় কোনো তোড়জোড় নেই, নেই কোনো উদ্দীপনা। চারপাশ থেকে চারিত্রিক অবক্ষয় গ্রাস করেছে মুসলিম সমাজকে। বিকৃত রাজনীতি ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি তার ভিত কাঁপিয়ে তুলেছে। অপসংস্কৃতির বেসামাল স্রোত ঢুকে গেছে মুসলিম জাতির খাঁজে খাঁজে।

এতে করে মুসলিম উম্মাহ তার স্বকীয়তা হারাচ্ছে। নিজের অজান্তেই আপন বোল ও খোলস বদলে ফেলেছে। নিজের গতিপথ হারিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে। আপন ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভুলে গেছে। কিন্তু এই সর্বগ্রাসী অবক্ষয় রোধে কোনো দৃপ্ত শপথ নেই। এই অভাবনীয় করুণ পরিণতির মোকাবিলায় নেই কোনো সংযত পদক্ষেপ! সবাই বেসামাল, বেপরোয়া বাউণ্ডলে!

তাই এখন সময় এসেছে যুবকদের জাগিয়ে তোলার। নির্লিপ্ত ও ভাবলেশহীন তরুণদের ঘোর কাটানোর। ক্রীড়ায় মত্ত অবচেতন কিশোরের চৈতন্য ফিরিয়ে আনার! এখন তো সময় ডাক দিয়ে যাওয়ার!

সমাজ এখনও তার আপন গতিতে চলছে, বেপরোয়া বেসামাল হয়ে। বড়ো বড়ো চোর সমাজের প্রতিষ্ঠিত নটরাজ; সমানতালে নেচে-গেয়ে চলছে, আনন্দে-ফূর্তিতে মেতে আছে। কিন্তু তাদের কিচ্ছুটি হয় না। ধরা পড়ে ছোটো ও ছিঁচকে চোরগুলোই; শাস্তি পায়। পকেটমারের ওপর আইন তার খড়্গ বসায়। কারাগারে চালান দেয়। বড়ো বড়ো গডফাদার মুক্ত আকাশের নিচে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়; স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গ, কোথাও কোনো বাধা নেই। অথচ সৎ ও ভালো লোকগুলো দূরে একান্তে নিভৃতে চুপচাপ বসে আছে। মুখে কোনো রা নেই। তাদের স্বর ক্ষীণ, অস্ফুট। আর খারাপ ও অসৎ লোকগুলো হল্লা করে বেড়ায়। পাড়া মাথায় তুলে নাচে। তাদের হই-হুল্লোড় আর চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘরে থাকা যায় না।

ভালো ও কল্যাণকর কাজগুলো চাপা পড়ে যায়। খারাপ ও অর্থহীন কাজের বিজ্ঞাপনে ভরে যায় সমাজ ও দেশ। ইসলাম হয়ে পড়েছে যেন স্বদেশেই ভিনদেশি। আপন জায়গায় পরগাছা। স্বজনদের কাছে অবহেলিত। অনাদর অবজ্ঞার শিকার। এই করুণ সময়ে, এই কঠিন মুহূর্তে আমরা যুবসমাজকে দোষ দিতে পারি না। তাদের ক্ষোভ ও রাগ, গর্জন ও চিৎকার, অসন্তোষ ও অপ্রসন্নতাকে নিন্দা করতে পারি না। পারি কি?

যতদিন শরিয়াহ অকার্যকর থাকবে, কুরআন পরিত্যক্ত ধূলোমলিন হয়ে থাকবে এবং কুরআনের প্রকৃত দায়িরা থাকবে বিচ্ছিন্ন। উম্মাহর মন-মানসজুড়ে প্রভাব বিস্তার করতে এবং তার জীবন-প্রবাহে সঠিক দিকনির্দেশনার ছাপ রেখে যেতে ব্যর্থ হবে, ততদিন কোন মুখে আমরা তরুণদের সামনে দাঁড়াব?

হ্যাঁ, আমরা তরুণদের উদ্দাম প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনাকে নিন্দা করতে পারি না। কারণ, আমাদের কর্মকৌশল, নানামুখী অবস্থান এবং দুশমনদের বস্তাপচা আইডিয়ার জুতসই জবাব দিতে ব্যর্থতা। আত্মপক্ষ সমর্থনের সহজাত তাড়না ও আত্মরক্ষার স্বভাবজাত প্রবণতা মানুষকে তাড়া দেয়, উসকে দেয়। আমাদের দ্রোহী তরুণদেরও নাড়া দেয়। তাদের মনোজগৎকেও ক্ষিপ্র করে তোলে। সামনের বাধার প্রাচীর আসা পর্যন্ত তারা গেয়ে চলে প্রাচীন কবির গান–

> 'যখন কোনো জাতি আমার সাথে লড়তে আসে, আমি তার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াই। এ কি আমার অত্যাচারী মনোভাব? আচ্ছা, আত্মরক্ষার কবচ, পরিশুদ্ধ হৃদয় আর তপ্ত ধারালো তরবারি কি নিপীড়কের বেশ?'

আমরা যদি সত্যই তরুণদের জন্য কিছু করতে তৎপর হই, এই বিপ্লবী প্রজন্মের অন্তত কিছু সমস্যার সমাধানে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিই, তবে প্রথমে তাদের সমস্যাগুলো খুঁজে বের করতে হবে; রোগীর প্রতি একজন প্রকৃত ডাক্তারের মর্মবেদনা এবং সহানুভূতি নিয়ে তাদের পাশে বসতে হবে। কারণ, তারা তো কোনো দাগি আসামি নয়, আর আমরাও জেলের দারোগা নই!

বিপ্লবের দায় ও দায়বদ্ধতা

বিপ্লবের প্রতি সৎ থাকা ও ন্যায়পরায়ণতার দায় আমাদের ভেতরে প্রণোদনা দেয়; বলতে শেখায়, যারা উদ্দীপনার নেশায় পড়ে বুঁদ হয়ে থাকে, বেসামাল হয়ে পড়ে থাকে, তারা কিছুতেই সাধারণ বিপ্লবের একটা সীমিত অংশের বেশি কিছু হতে পারে না। ঘোরের মায়ায় আটকা পড়া কিছু তরুণকে দিয়ে কি বিপ্লবের সমগ্র স্রোত ও প্রবাহকে বিচার করা যায়? এ কি ন্যায়ের কথা হবে? গঠনমূলক সমালোচনার মনোভাব কি সে কথা বলে? অথচ এই তরুণদের কোনো দুরভিসন্ধি নেই। কোনো কুমতলব নেই। বরং তাদের এই একমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আপাতদৃষ্টিতে স্বেচ্ছাচারী মনোভাব এবং বাড়াবাড়িমূলক আচরণের কিছু কারণও আছে। আছে পরিস্থিতির বাস্তবতা। অনেক মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতাও আছে!

এসব ব্যাপারে এমন চেতনাদৃপ্ত উদ্দীপনার কিছু ক্ষেত্রও আছে। ইসলামি বিপ্লব সেখানে দানা বাঁধে। তার শক্ত শিকড় বেশ গভীরে চলে যায়। আর এই ইসলামি জাগরণ হলো ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাসের জাগরণ। ইসলামি শরিয়াহ ও জীবন-পদ্ধতির উন্মেষ। ইসলামি ভূখণ্ডের উত্থান!

কেউ যদি ইসলামি আকিদা ও মতাদর্শ হৃদয়ে ধারণ করে, আল্লাহর মর্যাদা ও অবস্থান, রাসূলের সম্মান ও যথাযথ স্থান, কুরআনের পবিত্রতা কিংবা ইসলামের আকিদার অন্য কোনো স্তম্ভকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে নির্দিষ্ট গণ্ডি ও সীমারেখা মেনে চলে, তবে চোখের পলকে ও বিদ্যুতের ঝলকানির ভেতরেই দুনিয়া ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। জ্বলন্ত আগ্নেগিরির সৃষ্টি করতে পারে,

যা অনবরত লাভা উদগিরণ করে যায়। এভাবেই এক পর্যায়ে ইসলামের ঝান্ডা উত্থিত হয়। কালিমা খচিত পতাকা উড্ডীন হয়। কুফরি শক্তি নিপাত যায়। বাতিল ধ্বংস হয়ে যায়।

আমরা শরিয়াহর উর্বর ভূমিতে দেখি বিপ্লবের উত্তপ্ত লাভা! লাভার উদ্‌গিরণে ইসলামের শ্বাশত অবিনাশী চেতনা ঝলসে ওঠে। ঘোষকের কণ্ঠে জীবনাচারে ইসলামি শরিয়াহর চর্চা ও বাস্তবায়নের কথা উপচে পড়ে। তার সুনিবিড় ছায়াতলে এসে আশ্রয় নেওয়ার আকুলতা ফুটে ওঠে। মুসলিম দেশগুলোতে উপনিবেশের রেখে যাওয়া পদছাপ, তার শাসন-শোষণের প্রভাব এবং উপনিবেশবাদী আইন ও প্রথার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির দরদি আহ্বান ঝরে পড়ে।

মুসলিম দেশগুলোতে এর প্রভাব চোখে পড়ে। ঈমানি বিপ্লবের ভিত্তি সেখানে অনেক গভীরে প্রোতিত। মুসলিম উম্মাহর নানা প্রয়োজনে ও দুঃসময়ে, নানা স্বার্থে ও ক্রান্তিলগ্নে কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়ার মতো শহরে হাজারো মানুষের পদযাত্রা দেখা যায়। মিছিলে, স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে উঠে রাজপথ। ইসলামের নানা ব্যাপার নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন হয়। বিভিন্ন সম্মেলনের আয়োজন হয়। ফিলিস্তিন, লেবানন, ফিলিপাইন, আফগানিস্তানের পক্ষে মুসলমানদের প্রতিবাদী স্বর উচ্চকিত হয়। ধীরে ধীরে মুসলিম ইস্যুটি জীবন্ত হয়ে ওঠে, নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। অথচ এই ইস্যুটিকে গলা টিপে হত্যা করার কম পায়তারা হয়নি!

বিরামহীন কর্মস্পৃহাসঞ্চারী বিপ্লব

ইসলামি বিপ্লব বুদ্ধির মুক্তি এবং বোধের উদ্বোধনের পাশাপাশি ইচ্ছা ও মনোবলের শক্তিও সঞ্চার করে। কর্মপ্রেরণা ও উৎপাদনমুখী চিন্তার উদ্রেক যেমন করে, তেমনি জীবনাচারেও এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের সূচনা করে।

এই বিপ্লব ঈমানকে আমলে রূপান্তর করে। মতাদর্শকে জীবনের আচার ও পদ্ধতিতে রূপ দেয়। আর এটা বিশুদ্ধ ইসলামি ঈমানের রূপ। ঈমান তো কোনো আকাঙ্ক্ষা, শোভা কিংবা মুখের দাবির নাম নয়; ঈমান হলো যা হৃদয়কে আন্দোলিত করে, প্রতিটি কাজে যার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে।

কুরআনেও আমরা তার চিত্র দেখি। কুরআন ঈমানকে জুড়ে দিয়েছে ভালো কাজের সঙ্গে। জান্নাতের প্রাপ্তি ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি সবকিছুকেই আমলের সুতোয় বেঁধে দিয়েছে। আবার এই পার্থিব জীবনের সমস্ত কল্যাণ ও অগ্রগতির পূর্বশর্ত করেছে এই আমলকে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'যে ভালো আমল করেছে তার প্রতিদান আমি কিছুতেই নষ্ট করি না।' সূরা কাহাফ : ৩০

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

> 'আর যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমাদের বানানো হয়েছে, তার কারণ তোমাদের আমল।' সূরা জুখরুফ : ৭২

কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তিই এই বিপ্লবের তরুণ-তরুণীদের ইসলামি জীবনাচার ও শিষ্টাচার পালনের ক্ষেত্রে তর্কে জড়াবে না। ফরজ বিধানগুলো আদায় করা যেমন কর্তব্য, তেমনি হারাম কাজগুলো থেকে বিরত থাকাও আবশ্যকীয়।

আর এভাবেই ধীরে ধীরে মসজিদগুলো আবাদ হয়ে উঠবে। মুসল্লিদের উপস্থিতি ও জিকির-তিলাওয়াতে গমগম করবে। হজের মৌসুমে উঠতি প্রজন্মের বিশাল উপস্থিতি দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে, মন ভরে উঠবে। আর আমরা দেখব, এরাই এই বিপ্লবের প্রতিনিধিত্ব করছে। মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে তারা যোজন যোজন দূরে থাকবে। সব ধরনের অবৈধ হারাম ক্রীড়া-কৌতুক এমনকী সিগারেট পর্যন্ত এরা ছুঁয়ে দেখবে না। ঘটনাচক্রেও সিগারেটের সাথে এদের পরিচয় থাকবে না।

বরং এরা ইসলামি শিষ্টাচার এবং রীতিনীতির পুনর্জন্মের ও প্রচারের কাজে মগ্ন থাকবে। দীর্ঘদিন ধরে হারিয়ে যাওয়া অপ্রচলিত সুন্নতের বিকাশে কাজ করে যাবে। মানুষের বাস্তব জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া আমলের প্রচলন করবে। যেমন : দাড়ি লম্বা করা, যথার্থ হিজাব পরা, রমজানে ইতিকাফ করা, খোলা উন্মুক্ত প্রান্তরে ঈদের নামাজ আদায় করা, এমনি আরও অনেক পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত সুন্নাত।

এই বিপ্লবের কর্মীরা অনেক সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করবে, সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করবে। নানা কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করবে এবং স্বেচ্ছায় এই কাজগুলোর নেতৃত্ব দেবে। এমন চিত্র আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, আফ্রিকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করেছে অনেকে। তেমনিভাবে আফগানিস্তান, লেবানন এবং ফিলিস্তিনের শরণার্থী ও দেশত্যাগী মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এভাবেই এই বিপ্লব ইসলামের এক কর্মবিপ্লবে পরিণত হয়– ইসলামের মাধ্যমেই যার উদ্বোধন।

ইসলামের জন্য কাজ করা বলতে বোঝাচ্ছি, ইসলামের দাওয়াতের বোঝা বহন করা। ইসলামকে মানুষের জীবনে বাস্তবায়ন ও দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদ ও রাজনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাষ্ট্র, শক্তি ও চরিত্র, মতাদর্শ ও শরিয়াহর ঝান্ডা হাতে তুলে নেওয়া, যেন মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনাচার তার বিশ্বাসের আলোয় বিম্বিত হয়। আচরণের গতিবিধি স্বচ্ছ হৃদয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। মুসলিম উম্মাহকে সব ধরনের শৃঙ্খল ও বিজাতি শাসকের দণ্ড থেকে মুক্ত করার প্রয়াস চালায়। কিংবা যেসব শাসকরা তাকে তার মূলচ্যুত ও শিকড়হীন করার পায়তারা করে, তার গৌরবময় সমৃদ্ধ অতীত, উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলরূপ এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য ভুলিয়ে দিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে যেন বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যায়!

আর এভাবেই এই বিপ্লবের স্বতন্ত্র সত্তা ও আলাদা রূপ দাঁড় করানো হবে। পতনের যুগ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রথাগত বিপ্লবের খোলস থেকে বেরিয়ে আসবে। ধর্মের অবিনাশী চেতনায় উজ্জীবিত হবে বিপ্লবের এই নতুন ধারা!

প্রথাগত বিপ্লবে ধর্মীয় চেতনার ক্ষীণ অস্তিত্ব পাওয়া যেত বটে, তবে সেখানে জীবনের গভীর সমস্যার নিপুণ দরদি সমাধান ছিল না। উম্মাহর বড়ো বড়ো সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে কোনো মৌলিক ইশতেহার পাওয়া যায়নি। সারবত্তাহীন ঘোলাটে বক্তব্যে ভরপুর ছিল সেইসব বিপ্লবের স্লোগান!

এতে বিন্দু পরিমাণ সংশয় নেই যে বর্তমান যুগের নতুন সব বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সূচিত হয়েছে এই আন্দোলন। বিশেষ করে 'ইখওয়ানুল মুসলিমিনের' হাত ধরে এসেছে বিপ্লবের এই নতুন ধারা!

গাজায়, পশ্চিম তীরে এবং ফিলিস্তিনের অধিকৃত অঞ্চলজুড়ে চলা শেষ তীব্র আন্দোলন (প্রথম ও দ্বিতীয় ইন্তিফাদা) কিন্তু এই আন্দোলনেরই ফসল। আফগানিস্তানের পাহাড়ি অঞ্চলে শক্তিশালী দুর্বিনীত বিশাল শত্রু বাহিনীর সামনে অবিরাম লড়ে যাওয়ার অমিত সাহস জুগিয়েছে এই বরকতময় বিপ্লব। ওই পাথুরে ভূমি প্রতিকূল পরিবেশে একের পর এক বিজয় ছিনিয়ে আনার মন্ত্রণা দিয়েছে এই মহান বিপ্লব!

সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন ও খ্রিষ্টানদের হিংসা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে উত্তর ফিলিপাইনে বেশ কয়েক বছর ধরে চলে আসা কিছু মুসলিম ভাইদের সুতীব্র আন্দোলনও এই বিপ্লবের ফসল।

সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামি শরিয়াহর রূপদানের অবিরাম প্রচেষ্টার পেছনে মূল অনুঘটক ছিল এই বিপ্লব।

শিক্ষিত যুবসমাজের বিপ্লব

ইসলামি বিপ্লবের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান হলো যুবসমাজ। এই যুবসমাজই বিপ্লবে এনেছে আলাদা রূপ ও আলাদা ব্যঞ্জনা। যুবসমাজই এর মূল চালিকাশক্তি। উঠতি তরুণ-তরুণীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই এই বিপ্লবে প্রাণ সঞ্চার করেছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষিত যুবসমাজই এর মূল প্রাণ। তাদের আন্তরিক অংশগ্রহণই এর মূল শক্তির উৎস। আর এই যুবসমাজই বাধার প্রাচীর উজিয়ে সামনের দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে। এদের হাত ধরেই আসবে রাঙা প্রভাত; সুন্দর আলো-ঝলমলে আগামী।

একটা ব্যাপার বেশ চোখে পড়ে, যেসব ছাত্র মেডিকেল কলেজ, ফার্মেসি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে পড়ে, দ্বীনের কাজে তাদেরই বেশি দেখা যায়। এই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রে ভরপুর। অথচ তাদের প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়। অনেক কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করেই তারা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। আর তুলনামূলকভাবে এই ছেলেগুলোই একটু বেশিই মেধাবী ও পড়ুয়া। অথচ শরিয়াহ ফ্যাকাল্টিতে যারা পড়ে, তারা দ্বীনি কাজের ব্যাপারে ভাবলেশহীন হয়। আল আজহারেও এই দৃশ্য চোখে পড়ে। আজহারের ডাক্তারি, ফার্মেসি ও প্রকৌশল অনুষদের ছাত্রদের বড়ো একটা অংশ দ্বীনি কাজে নিয়োজিত। এরাই ইসলামি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়, বেগবান করে; দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেয়। দ্বীনি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় এরাই।

এখান থেকে একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে যে জ্ঞানের জগতে এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অগ্রসর মেধাবী ছেলেরাই মূলত এই কাজের গতি চালু রেখেছে। তাদের সামাজিক, চারিত্রিক এবং ব্যক্তিগত অন্যান্য যোগ্যতার বিকাশের পাশাপাশি তারা এই কাজ করে যায়।

একসময় মসজিদের মুসল্লি ছিল জীবনের মায়া ত্যাগ করা বৃদ্ধরা। যাদের পা কবর প্রান্তে চলে গেছে, সেই সব অক্ষম-অসহায় মানুষের ভয়ার্ত চিত্তের প্রশান্তির নীড় ছিল মসজিদ। জীবন ভোগের সুযোগ তাদের নেই। পৃথিবীর নানা রূপ-রসে সিক্ত মদিরার পেয়ালায় তাদের ভাগ নেই। ফলে তারা একপ্রকার বাধ্য হয়েই জীবন-খাতার শেষ কয়েকটা পাতা নামাজ, জিকির ও তওবার শুভ্রতায় ছেয়ে দিতে চায়।

এখন দৃশ্যপট বদলে গেছে। মসজিদের সাথে দূরতম সম্পর্কও আছে এমন ব্যক্তিও জানে, এখন নামাজের ব্যাপারে সজাগ দেখা যায় যুবকদের। জামায়াতে শামিল হওয়ার ব্যগ্রতা লক্ষ করা যায় তরুণদের মাঝে। উঠতি বয়সের যুবক ও যৌবনের বর্ণিল জগতে পা রাখা টগবগে তরুণ এখন মসজিদের প্রাণ। তারা খোদার কাছে রহমতের আশা করে। কিয়ামতের দিন যখন কোথাও কোনো ছায়া থাকবে না, একদণ্ড বিশ্রামের সুযোগ থাকবে না, সেদিন তারা খোদার আরশের নিচে ছায়া পাওয়ার স্বপ্ন বোনে। আল্লাহর আনুগত্য করেই তারা বড়ো হয়েছে। তাদের হৃদয়জগৎ মসজিদের সাথে আটকা। আল্লাহর খাতিরে মানুষকে ভালোবাসে তারা এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির নিমিত্তেই সেই বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটায়; তাতে পার্থিব কোনো স্বার্থের ছায়াও থাকে না। তাদের জীবনের সবকিছুই আল্লাহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

হজের মৌসুমগুলোতে কাবা চত্বরে যুবকদের উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ে এখন। সমস্ত পর্যবেক্ষকের এটাই পর্যবেক্ষণ। সমস্ত পরিসংখ্যান এ কথাই বলে।

আজকের বাজারে যত ইসলামি বই বিক্রি হচ্ছে, অধিকাংশ পাঠক হলো তরুণ সমাজ। জ্ঞানের প্রতি প্রবল তৃষ্ণা ও অতৃপ্ত বাসনা তাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। তাদের লক্ষ্য নির্ধারণে ইসলামি বইয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। বই তাদের চলার পথ আলোকিত করে দেয়। বিশেষত যাদের মাঝে জ্ঞান ও ধর্ম, নিরাপদ দৃষ্টিভঙ্গি, স্বচ্ছ আমানতদারিতার ব্যাপারে নিষ্ঠা ও আগ্রহ দেখা যায়,

তারাই পড়ছে এসব বই। যারা দায়িত্বের ভার নিতে প্রস্তুত, তারাই মূলত ইসলামি বইগুলোর দিকে ঝুঁকছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'যারা আল্লাহর বাণী ও বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়, তাঁকে ভয় করে চলে অন্য কাউকে নয়, তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।' সূরা আহজাব : ৩৯

তরুণরাই এই বিপ্লবের মূল ভিত্তি। যুবকরা সব যুগেই আসমানি বার্তার পৃষ্টপোষক এবং খোদায়ি দাওয়াতের মাঠের কর্মী। কারণ, তরুণদের হৃদয় থাকে স্বচ্ছ। অনুভূতি হয় কোমল। প্রত্যয় হয় দৃঢ়।

কুরআন আমাদের দ্বীনের জন্য আদর্শবান তরুণদের ত্যাগ ও কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁরা ঈমানি জজবায়, তাকওয়ার বিশুদ্ধতায়, ধৈর্য ও সাহসিকতার পরাকাষ্ঠায় এবং আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের ময়দানে ছিল অতুলনীয়। তাঁদের দিকে মানুষ বিমুগ্ধ চোখে থাকিয়ে থাকত। ঘাড় উঁচিয়ে দেখত।

কুরআন মূর্তি ভেঙে পৌত্তলিকতার গোড়ায় আঘাত করা ইবরাহিম (আ.)-এর কথা বলে। তাঁর কুঠারাঘাতে চূর্ণ হয়ে যায় প্রতিমার পর প্রতিমা। ইবরাহিম (আ.) তখনও যুবক। উঠতি বয়সেই তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, আর এতে থমকে যায় তাঁর স্বজাতি!

কুরআন আমাদের ইসমাইল (আ.)-এর কথা বলে। ছোট্ট শিশু বাবার কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আপন মস্তক সঁপে দিয়েছিল। আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছিল। কোনো দ্বিধা, সংশয়, আড়ষ্টতা ও গড়িমসি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। নির্ভীক চিত্তে নির্দ্বিধায় নিজেকে খোলা তরবারির নিচে সঁপে দিয়েছিল। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'সে বলল– "হে আমার পিতা! আপনি নির্দেশ অনুসারে কাজ করুন। আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।"' সূরা সাফফাত : ১০২

কুরআন আমাদের ইউসুফ (আ.)-এর কথা বলে। গভর্নরের স্ত্রীর প্ররোচনা ও অসৎ উদ্দেশ্যে সাড়া না দেওয়ার অসীম সাহসিকতা এবং অন্তরের বিশুদ্ধতার অনুপম চিত্রায়ণ কুরআন আমাদের কাছে তুলে ধরে। কুরআনের ভাষায়–

> 'হে আল্লাহ! কারাগার আমার কাছে তারা যে দিকে আহ্বান করছে তার চেয়ে প্রিয়।' সূরা ইউসুফ : ৩৩

কুরআন ইয়াহইয়া (আ.)-এর কথা বলে; যাকে উদ্দেশ্য করে কুরআন বলেছে–

> 'হে ইয়াহইয়া! দৃঢ়তার সাথে কিতাব আঁকড়ে ধরো। আমি তাঁকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম এবং আরও দিয়েছি আমার পক্ষ থেকে দয়া ও বিশুদ্ধতা। সে ছিল মুত্তাকি এবং বাবা-মায়ের প্রতি সদাচরণকারী। সে কখনোই অবাধ্য ও দাম্ভিক ছিল না।' সূরা মারইয়াম : ১২-১৪

কুরআন আমাদের মুসা (আ.)-এর আনুগত্যের কথা বলে। কুরআনে এসেছে–

> 'মুসার প্রতি কেউ ঈমান আনেনি ফেরাউন ও তার সভাসদের ভয়ে। কেবল তাঁর স্বজাতির কিছু লোক ঈমান এনেছিল; যারা ছিল নবীন।' সূরা ইউনুস : ৮৩

কুরআন আমাদের আসহাবে কাহাফের কথা বলে। কুরআন বলছে–

> 'তাঁরা কিছু তরুণ যারা তাঁদের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছিল। এবং আমি তাঁদের সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।' সূরা কাহাফ : ১৩

ইতিহাস আমাদের রাসূল ﷺ-এর কথা বলে। সাহাবায়ে কেরাম নির্দ্বিধায়, অকুণ্ঠচিত্তে নবিজি ﷺ-কে সাহায্য করেছিলেন, মনোবল জুগিয়েছিলেন এবং নবিজির আনীত আলো গ্রহণ করেছিলেন। এই সাহাবাদের বড়ো একটা অংশ ছিল উঠতি বয়সের তরুণ।

তাই বর্তমান যুগেও যুবসমাজ জেগে উঠবে। তারাও পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্বীনের জন্য জীবনবাজি রাখবে। সুন্দর আগামী রচনায় আত্মনিয়োগ করবে।

নারী-পুরুষের বিপ্লব

ইসলামি বিপ্লবের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য হলো– এই বিপ্লবে নারীদের কাজ করার একটা বিশাল সুযোগ আছে, অনেক বড়ো সুযোগ; তা সহজেই সচেতন মানুষের চোখে পড়বে।

মেয়েদের সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা হবে 'হিজাব' মেনে চলা। হিজাব বলতে মেয়েদের জন্য শরয়ি যে 'ড্রেসকোড' আছে তাই বোঝাচ্ছি। অর্থাৎ সমগ্র শরীর, মুখমণ্ডল এবং দুই হাত ঢেকে রাখা– এমনটাই অধিকাংশ আলিমের মত। সব ধরনের অশ্লীলতা ও কাম জাগানো পোশাক থেকে দূরে থাকা। শরীরের অঙ্গের আভাস পাওয়া যায় এমন কাপড় বর্জন করে চলা। কথায় ও আচরণে ভাবগাম্ভীর্য ধরে রাখা। হাঁটাচলায় ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য বজায় রাখা, যেন কিছুতেই কোনো রুগ্ন মানসিকতার ভারে ক্লিষ্ট লোকের লোভের বস্তু হয়ে না যায়। কিছুতেই যেন নিজেকে সস্তা বিনোদন ও ভোগের সামগ্রীতে পরিণত না করে। নিজেকে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখবে না। অন্যকে কাছে টানার কৌশল ও ফন্দি আঁটবে না।

আমি এখনও ভেবে হয়রান হয়ে পড়ি, মুসলিম দেশগুলোর বড়ো বড়ো শহরে কোনো হিজাব পরিহিতা তরুণী চোখে পড়ে না। এমন কত বছর গেছে, কদাচিৎ কোনো কোনো মেয়েকে হিজাব পরতে দেখা যেত। এমনকী কালের আবর্তে চামড়া ঢিলে হয়ে যাওয়া বৃদ্ধারাও পশ্চিমা কাপড়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। গাউন, টপস, টি-শার্ট ইত্যাদি হাল-ফ্যাশনের আঁটসাঁট পোশাকে নিজেদের উপস্থাপনের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

অথচ এই পোশাকগুলো পশ্চিমা ইহুদি, খ্রিষ্টান রমণীদের রুচির সাথে সংগতি ও মিল রেখে তৈরি। সেসব দেহ বিলানো জামা-কাপড়ে কি মুসলিম রমণীদের শোভা পায়?

গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শুরুতে আমি একটা কথা বেশ জোর গলায় বলতাম, আমরা মুসলমানরা ধেয়ে আসা পশ্চিমা সভ্যতার কাছে মোটাদাগে তিনটি জায়গায় ধরা খেয়ে গেছি–

১. **অর্থনীতির ময়দানে :** আমাদের অর্থনীতিতে জাকাতের কোনো ভূমিকা নেই। জাকাত পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে। অথচ জাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। অন্যদিকে সুদ হয়ে গেছে বৈধ। সুদের কারবার ও লেনদেন বেড়ে গেছে। অথচ সুদ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়ো ধ্বংসাত্মক বস্তু। আর এখন প্রচলিত কথা হলো, অর্থনীতির চাকা সচল রাখবে ব্যাংক, আর ব্যাংক সচল রাখবে মুনাফা-সুদ!

২. **নারী :** পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণ ও বিজাতীয় সংস্কৃতির গণজোয়ার মুসলিম রমণীদের বেপর্দা করেছে। তার ইজ্জত-আবরু লুটে নিয়েছে। তাকে স্বকীয়তাহীন ও ব্যক্তিত্ববিবর্জিত রক্তে-মাংসে গড়া এক মানবীতে পরিণত করেছে। ফলে সে বেরিয়ে পড়েছে। ইসলামের রীতিনীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ভুলে গেছে। সমাজে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার জোয়ার বইয়ে দেওয়ার মন্ত্রে পরিণত হয়েছে। সমগ্র উম্মাহর চারিত্রিক স্খলন ও নৈতিক অবক্ষয়ের এক মাধ্যমের নাম রমণী। আজকের প্রত্যেক রমণী যেন এক একটা ধারালো কুঠার, যার আঘাতে আঘাতে ধসে পড়ছে নৈতিকতার এক একটা সৌধ। রমণীরা ইসলামের রীতিনীতি থেকে নিজেদের মুক্ত করার দৌড়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেওয়া বুলি তারা আওড়াচ্ছে। 'নারী স্বাধীনতা'র বুলি কপচানোই এখন তাদের আরাধ্য।

৩. **শিল্পের জগৎ :** পাশ্চাত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর অস্ত্র হলো তথাকথিত শিল্প। শিল্পের মোড়কে উপস্থাপন করছে নিজেদের কূটকৌশল। সেই কূটকৌশলে মুসলিম উম্মাহ ঘায়েল হয়ে পড়েছে। কথিত সেই শিল্প আজ প্রতিটি ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে। সকাল-সন্ধ্যাজুড়ে তার উপস্থিতি। মুসলমানদের পাঠে, বক্তব্যে, দেখা ও শোনায় তার উপস্থিতি। নানা মাধ্যমে, বিভিন্ন শক্তিশালী ডিভাইসের সহায়তায় তা পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে।

মানুষের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, ঝোঁক ও প্রবণতা, রুচি-অভিরুচিজুড়ে এই কথিত শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। ফলে মুসলিম উম্মাহর রাজনীতি, সমাজ-কাঠামো, চরিত্র ও মনের মুখোশ সবকিছুতেই এই 'শিল্পের' প্রচ্ছন্ন আভাস দেখা যায়!

আলহামদুলিল্লাহ! এখন মঞ্চের দৃশ্যপটে বদল ঘটেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ময়দানে আমরা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছি। এই দুই ক্ষেত্রে নানা কাজ ও নানা উদ্যোগ দেখা যায়। আমরা পুরোনো অবস্থান ফিরে পেতে শুরু করেছি। আমাদের মাঝে গেড়ে বসা হতাশা কেটে যাচ্ছে। আশার আলো দেখা যাচ্ছে। মুসলিম সমাজে উদ্যম ফিরে এসেছে।

অর্থনীতির ময়দানে নানা কাজ হয়েছে। বেশ তথ্যনির্ভর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। অনেক বড়ো বড়ো অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে। ইসলামি অর্থনীতির ধারণা মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। এই ক্ষেত্রে লেখালেখি, বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন এবং নানা বই ইসলামি অর্থনীতির ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা ও জীবনমুখী নীতির বাস্তবতা প্রমাণ করেছে। সেই সাথে প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনীতির অসারতা ও শোষণমূলক নীতিও মানুষের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছে। এখন ইসলামি অর্থনীতিবিষয়ক দেশে-বিদেশে নানা কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন হচ্ছে। ইসলামি অর্থনীতির নানা দিক ও নানা ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ইসলামি অর্থনীতিবিষয়ক নানা কমিটি ও সংঘ গঠিত হচ্ছে। এসব সংঘ ইসলামি অর্থনীতির ওপর বিভিন্ন বই প্রচার করছে। সুদের অবৈধতা ও ক্ষতি তুলে ধরছে। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গড়ে তুলছে। আর ইসলামি বিধান মেনে এবং ইসলামি অর্থনীতি প্রয়োগ করে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। এ ছাড়াও সুদমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে নানা কর্মমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। নানা দেশে ইসলামি অর্থনীতির ওপর নানা কার্যক্রম, মাসিক গবেষণাপত্র, বিভিন্ন ম্যাগাজিন ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে। অনেক দেশে বিভিন্ন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যা ইসলামি অর্থনীতির নানা খুঁটিনাটি নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে।

এতেই শেষ নয়। ইসলামি অর্থনীতির ওপর অনেক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত এবং হাজারো কোম্পানি চালু হয়েছে। ধীরে ধীরে এই সংখ্যা বেড়েই চলছে।

নারীদের মাঝেও ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। হিজাব ও সুন্নাহসম্মত পর্দার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছে। অথচ একসময় কদাচিৎ পর্দানশীন মেয়ে চোখে পড়ত। সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হলো, এখন মুসলিম রমণীরা ইসলামের গণ্ডির ভেতরে চলে এসেছে। তারা স্বেচ্ছায় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে ভিড় করেছে। এ ক্ষেত্রে কেউ তাদের বাধ্য করেনি– স্বামী, বাবা-মা কিংবা অন্য কেউ-ই তাদের সে দিকে ঠেলে দেয়নি; বরং হয়েছে উলটোটা। পর্দা পালন করতে গিয়ে তারা মানুষের ঠাট্টা ও বিদ্রুপের শিকার হয়েছে। বাবা-মার সাথে তর্ক করতে হয়েছে। স্বামীর বিরাগভাজন হতে হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটা হয়েছে এবং এখনও ঘটে চলেছে।

মুসলিম নারীরা ইসলামের অবিনাশী চেতনাকে লালন করতে শুরু করেছে। প্রসন্নচিত্তে আল্লাহর হুকুম পালন করছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খোদার দেওয়া ফরজ মেনে চলছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'কোনো মুসলিম নারী-পুরুষের তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশের বিপরীতে ভিন্ন মত দেওয়ার কোনো অধিকার নেই।' সূরা আহজাব : ৩৬

তাই মুসলিম রমণীরা সমস্ত সফলতা ও কল্যাণকামিতা দেখছে আল্লাহর আনুগত্যে এবং যথাযথরূপে তাঁর হুকুম পালনের মাঝে। একমাত্র খোদার রাহেই মিলতে পারে সঠিক পথের দিশা! কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'যে আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করেছে, সে বিরাট সফলতা অর্জন করেছে।' সূরা আহজাব : ৭১

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

> 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে, সে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মাঝে ডুবে গেছে।' সূরা আহজাব : ৩৬

বৈশ্বিক ও সর্বজনীন বিপ্লব

ইসলামি বিপ্লব কোনো নির্দিষ্ট দেশ, ভূখণ্ড কিংবা কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর কাছে সীমাবদ্ধ নয়। আরব-অনারব সব দেশেই এই বিপ্লবের আঁচ লেগেছে। প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে, এশিয়া কি আফ্রিকা সব মহাদেশেই খোদায়ি বিপ্লবের বারুদ ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকী মুসলিম দেশের গণ্ডি পেরিয়ে অমুসলিম দেশের আনাচে-কানাচেও লেগেছে এই আগুন।

অনেক মুসলিম দেশ ঘুরে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সব দেশেই এই শ্বাশত বিপ্লবের ছোঁয়া লেগেছে। কানাডা, ইউরোপ, আমেরিকার নানা জায়গায় মুসলিম অভিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল এবং মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলও ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। যেখানেই গিয়েছি, সব জায়গায় ইসলামি জাগরণের ছোঁয়া দেখতে পেয়েছি। মুসলমানদের মাঝে বিশেষ করে মুসলিম যুবক-যুবতিদের মাঝে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেছে।

কুরআন হিফজ করার প্রতি অদম্য আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। উত্তমরূপে কুরআনের তিলাওয়াত এবং একাগ্রতার সঙ্গে ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে পাঠের প্রতি তীব্র মনোযোগ লক্ষ করা যাচ্ছে। হাদিস মুখস্থ করা এবং উপলব্ধি করার প্রতি ধুম পড়ে গেছে। সিরাতের পাঠ এবং ইসলামের ইতিহাসের পর্যালোচনা বেড়ে গেছে। ফিকহের প্রতি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য জানতে মানুষ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। তার চেয়ে বড়ো কথা হলো, জামায়াতে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব বেড়ে গেছে।

তাহাজ্জুদের প্রতি মানুষের ব্যাকুলত দেখা যাচ্ছে। সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোজা রাখার প্রবণতা বেড়ে গেছে।

আর যে কথা এখানে না বললেই নয় সেটা হলো, এই বিপ্লবের গুঞ্জন শোনা যায় ফিলিস্তিনের অধিকৃত অঞ্চলেও। ১৯৪৮ সালে প্রথম বিপর্যয়ের পর অনেকে মনে করেছিল ইহুদি কর্তৃত্বের অধীনে থাকার কারণে সেসব অঞ্চলের মুসলিমরা আপন স্বকীয়তা ও পরিচয় ভুলে যাবে, ইসলামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু ঘটেছে তার উল্টোটা। সেসব অঞ্চলেও নতুন ঈমানি বাতাস বইতে শুরু করেছে। ঈমানের জাগরণের ছোঁয়া লেগেছে তাদের গায়ে। তারা নির্জীবতা থেকে জেগে উঠেছে। ঘুমভাঙা জাগরণ দেখা দিয়েছে তাদের মাঝে। অজ্ঞতা দূর হয়ে জ্ঞানের আলো ঢুকে পড়েছে। নির্বিকার ও নির্লিপ্ত ভাব কেটে গেছে। ভুলে যাওয়া মন্ত্র স্মৃতিতে ফিরে এসেছে। পথহারা পথিক আবার ঘরে ফিরে এসেছে আপনজনের কাছে। আর এটাই ইহুদিদের ভাবিয়ে তুলেছে। তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে; পাছে ইসলামি চেতনা ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম নতুন করে তাদের বিজয়ের সবুজ দিগন্তে হাতছানি দেয়। আর এজন্য ইহুদিরা সকাল-সন্ধ্যা হাজারো রকমের হিসাব কষে।

বিপ্লবের কর্ম কোথায়

অনেক মানুষ উল্লেখিত কাজগুলো দেখে না। বিপ্লবের আনা পরিবর্তন স্বীকার করে না; বরং প্রশ্ন তোলে, ইসলামি আন্দোলন জীবনের নানা ক্ষেত্রে এমন কী ভূমিকা রেখেছে? মুসলিম উম্মাহর কোন সমস্যার সমাধান করেছে? আমাদের কোন কষ্ট দূর করেছে?

এইসব প্রশ্ন ভিত্তিহীন

এই প্রশ্নগুলো নানা দিক বিবেচনায় ভিত্তিহীন ও অসার। তার কিছু কারণ তুলে ধরছি–

প্রথম : ইসলামি আন্দোলন বা বিপ্লব একটা জাগরণের সূচনা মাত্র। নতুন পথচলার শুরু। এক নতুন সকালের উন্মেষ। যেমন : মানুষ ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তারপর ধীরে-সুস্থে কাজ শুরু করে। নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পেছনে ছুটে চলে। এটা তো নতুন দিনের আরম্ভ! নব জীবনের সূচনা!

দিনের শুরুতে একজন কর্মীর কাছে তেমন বেশি কিছু চাওয়া কি ঠিক? কিংবা চাকরির প্রথম সিঁড়ি মাড়ানো কোনো যুবকের কাছে অধিক কিছু আশা করা কি সংগত? যদি তা না হয়, তাহলে একটা নতুন বিপ্লবের কাঁধে এন্তার প্রত্যাশার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে? এটা কি বিবেক-বোধসম্পন্ন মানুষের সুস্থ মন সমর্থন করতে পারে?

দ্বিতীয় : নিশ্চয় বিপ্লব কোনো সমাজ-বিচ্ছিন্ন কাজ নয়। আমাদের জীবনেরই অংশ। অথচ আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আছি। আর বড়ো বড়ো আশা করে বসে আছি। ভেবে আছি শূন্যের ওপর বিপ্লব সফল হয়ে যাবে; অঘটন-ঘটনপটিয়সী হবে। আমরা শুধু নির্বিকার বসে থাকব, নিশ্চুপ চেয়ে থাকব আর বিপ্লব তার ফসল আমাদের ঘরে পৌঁছে দেবে!

বিপ্লব তো আমাদের জন্যই। আর তা আমাদের দিয়েই সাধিত হবে। আমাদের মাঝেই বিপ্লবের দানা বাঁধবে। যদি আমরা না জাগি, বিপ্লবের হাত ধরতে এগিয়ে না আসি, তাহলে কিছুতেই এই বিপ্লব সফল হবে না, আলোর মুখ দেখবে না।

তৃতীয় : বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি ইসলামি বিপ্লবের অনুকূলে নয়। প্রতি মুহূর্তে ইসলামি আন্দোলনকে নানা 'ট্যাগ' দেওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেছে। পৃথিবীর অনেক ভূখণ্ডেই ইসলামি আন্দোলনের পথ মসৃণ নয়। নানা প্রতিকূলতা ও বাধা উপেক্ষা করে কাজ করতে হয়। ডান-বাম সবদিক থেকেই ইসলামি আন্দোলনের কর্মীরা নিগৃহ ও নিপীড়নের শিকার হয়। ইসলামি আন্দোলনের গায়ে এমন এমন অপরাধ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যার থেকে তার অবস্থান যোজন যোজন দূরে। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মিথ্যা সাজানো মামলায় তার কর্মীদের বন্দি করা হয়, ফাঁসানো হয় এবং শাস্তি দেওয়া হয়। এমন প্রতিকূল পরস্থিতি ও কঠিন সময়ে ইসলামি আন্দোলনের পক্ষে আমাদের সব চাহিদা পূর্ণ করা সম্ভব? এমনকী তার নিজের স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নও কতটা সম্ভব?

পৃথিবীর নানা ভূখণ্ডের শাসককুলদের নানা আন্দোলন ও মতাদর্শের প্রতি বেশ উদার হতে দেখা যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আনুকূল্য, মিডিয়ার সমর্থন লাভ করে এইসব আন্দোলনের কর্মীরা এবং মতাদর্শ লালনকারীরা।

তারা অবাধে নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। তবে ইসলামি আন্দোলনের ক্ষেত্রে মিডিয়া ও মিডিয়া-কর্মীদের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। ইসলামসংশ্লিষ্ট সবকিছুতেই তাদের ভয়; তাদের গা জ্বালা করে। ফলে ইসলামি আন্দোলনের সবকিছুই নিষিদ্ধ হয়ে যায়!

চতুর্থ : বিপ্লব হলো মেধা ও মনন, অন্তরের দৃঢ়তা ও মনের জোর এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তির বিরাট এক কর্মযজ্ঞ। ধীরে ধীরে এই বিপ্লব বড়ো হচ্ছে। ডালপালা বিস্তার করছে। আপন বলয় ও জায়গা করে নিচ্ছে। এই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি আশাবাদী। সমাজের ও পৃথিবীর কিছু রীতি আছে, সেই রীতি বলে– এই বিপ্লব সফল হবে। সময়ের সাথে সাথে এই বিপ্লব কালের নানা দুর্যোগ ও সময়ের টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে যাবে। অন্য বিপ্লব ও আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি দেখবে। তাদের ভুল ও পদস্খলন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। ফলে নিজের পথচলা সহজ হবে। সংযত পদক্ষেপে পা ফেলার শিক্ষা পাবে। সঠিক পথে পা ফেলার সবক পাবে। কবি বলেছেন–

'আকাশের কোলে হেসে উঠে যবে এক ফালি বাঁকা চাঁদ,
পূর্ণিমা হয়ে ছড়াবে আলো; মানবে না কোনো বাধ।'

আধুনিক অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবী মনে করে, নতুন কোনো ইসলামি বিপ্লবের দরকার নেই। কারণ, ইসলাম এখনও মানুষের মন-মানসজুড়ে রয়ে গেছে। তাই নতুন করে ইসলামের জাগরণের কোনো দরকার নেই। ইসলাম আগের মতোই আপন মহিমায় ভাস্বর। এ বিষয়ে সর্বশেষ যার লেখা আমার চোখে পড়েছে, তিনি হলেন *আরবি* পত্রিকার সম্পাদক ড. মুহাম্মদ রুমাইহি। এই লোকের মতে, ইসলাম এখনও আগের মতোই বহাল তবিয়তেই আছে। পূর্বের মতোই শক্তিশালী সুপ্রতিষ্ঠিত!

অথচ আমরা জানি, মুসলমানরা মামলুকি যুগে এবং উসমানীয়দের শেষ যুগগুলোতে পশ্চাৎপদতা ও স্থবিরতার শিকার হয়েছিল। তাদের জীবন হয়ে পড়েছিল আবদ্ধ নষ্ট পানির মতো। ফিকহের অঙ্গনে কোনো ইজতিহাদ ও গবেষণা ছিল না। সাহিত্যে নতুন কোনো ধারা সূচিত হয়নি; সৃষ্টিশীলতার পরশ লাগেনি। বিজ্ঞানে নতুন কোনো আবিষ্কার দেখা যায়নি। শিল্পে কোনো উদ্ভাবন চোখে পড়েনি। এমনকী একপর্যায়ে তাদের স্লোগানই হয়ে গিয়েছিল–

'পূর্বসূরিরা উত্তরসূরিদের জন্য কিছুই রেখে যায়নি। যা ছিল তার চেয়ে বেশি কিছু সম্ভব নয়।' এই স্থবির ও পশ্চাৎপদ অবস্থাকে অস্বীকার করা কি ইতিহাস-অজ্ঞতা ও বাস্তবতা-জ্ঞানবিবর্জিত আচরণ নয়?

আচ্ছা, কোনো সুবিবেচক পাঠক কি আমাদের দেশগুলোতে উপনিবেশের প্রভাব অস্বীকার করতে পারবে? জীবনের নানা কর্মযজ্ঞে, মানুষের মন ও মগজে এবং চেতনা-জগতে উপনিবেশ বিরাট পরিবর্তন এনেছে– তা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারবে?

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে উপনিবেশের উপর্যুপরি আঘাত আমাদের জীবনে গভীর প্রভাব রেখে গেছে। আমাদের ভেতরটা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা বিলীন করে দিয়েছে। তাদের এই বহুমুখী আগ্রাসন থেকে রক্ষা পেয়েছে এমন মানুষ নেহাতই কম। ফলে আমরা আত্মভোলা হয়ে গিয়েছি। আপন দেশে পরবাসী হয়ে পড়েছি। নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে অপরিচিত আগন্তুকে পরিণত হয়েছি। আর সেটা হলো চিন্তা, চেতনা ও আপন পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা। এই পরিচয়হীনতা আগের মতো নয়, যা মুতানাব্বি বলে গেছেন– 'ভাষা, হাত ও চেহারায় অপরিচিত হওয়া।'

আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের অনেকে মনে করে– ইসলামি আন্দোলন বলে আসলে কিছুই হয়নি। কারণ, এই আন্দোলন শুধুই লম্বা জামার প্রচলন করেছে। লম্বা দাড়ির চল এনেছে। দাওয়াতের রীতি ও পদ্ধতিতে কঠোরতা ও রূঢ়তা এনেছে। জীবনাচারে রুক্ষতার প্রবেশ ঘটিয়েছে। তাই প্রকৃত বিচারে কোনো ইসলামি আন্দোলন হয়নি।

এ কথা আমি মানতে পারি না। ইসলামি আন্দোলনকে শুধুই কিছু প্রথা ও বাহ্যিক অবয়বের ছকে আটকে ফেলা স্পষ্টতই একটা অবিচার। এই আন্দোলন নতুন প্রজন্মের অনেক তরুণের জীবন বদলে দিয়েছে। তারা চিন্তার ভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়েছে। সৎ পথের দিশা পেয়েছে। বিচ্যুতি থেকে সরে এসেছে। জীবনাচারের শুদ্ধতার চর্চা শুরু করেছে। হৃদয়ের উদাসীনতা ও ভাবলেশহীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তুচ্ছ ও অর্থহীন ব্যাপারই ছিল তাদের জীবনের অনুষঙ্গ। এখন সেই চিত্র পালটে গেছে। উম্মাহর চিন্তা ও তার সমস্যার সমাধানই এখন তাদের ধ্যান-জ্ঞান।

কুরআনের সাথে তাদের নতুন করে পরিচয় ঘটেছে। কুরআনের তিলাওয়াতে ও মর্ম অনুধাবনে তারা এগিয়ে এসেছে। হাদিসের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। হাদিসের পাঠ ও হৃদয়ঙ্গমের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে। সিরাতকে তারা জীবনের দিশা ও আলো হিসেবে গ্রহণ করেছে। শরিয়াহই তাদের জীবনের মাপকাঠি এবং একমাত্র অবলম্বন। প্রথাগত চিন্তার দাসত্ব থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ থেকে রেহাই পেয়েছে। এখন তাদের একমাত্র গর্বের ধন হলো ইসলাম। তাদের চিন্তা হলো বাস্তব জীবনে ইসলামের প্রতিফলন, উম্মাহর ঐক্য এবং ইসলামি ভূখণ্ডের সত্যিকার মুক্তি। তারা এখন রোজাদার, নিয়মিত নামাজি এবং তাহাজ্জুদের প্রতি যত্নশীল।

অথচ তাদের মতোই অন্য যুবকরা কী করছে? গড্ডলিকার প্রবাহে ভেসে চলছে। বেপরোয়া পথচলা, অনেকটা উন্মাদের মতোই। জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, নেই কোনো নির্দিষ্ট গতিপথ। তারা অনেকটা অনুভূতিহীন, নির্জীব, নিষ্প্রাণ প্রাণী!

আবার একটা শ্রেণি আছে যাদের একমাত্র চিন্তাই হলো পেটের পূজা করা, মনোবৃত্তির দাসত্ব করা। তারা নামাজ ত্যাগ করেছে। প্রবৃত্তির পিছু নিয়েছে। সামান্য অর্থের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে। নেশার ঘোরে, মাদকের টানে, রিপুর তাড়নায় এবং প্রবৃত্তির পূজায় নিজেদের নিঃশেষ করে দিয়েছে।

আর নতুন প্রজন্মের ছেলেরা কী করছে, কোন কাজে ডুবে আছে, কী ত্যাগ দিচ্ছে– এসব ব্যাপারে খবর রাখা কি আমাদের দায়িত্ব নয়? এসব না জেনে হুট করেই তাদের নতুন নতুন 'ট্যাগ' দেওয়া কি অন্যায় নয়? অবিবেচক মনের পরিচয় নয়? তাদের পরিবর্তন ও কাজ না দেখেই আমরা শুধুই বাহ্যিক বেশভূষার ওপর ভর করে নানা কথা বলছি। মেয়ের পর্দা ও হিজাব এবং ছেলেদের লম্বা জামাই আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আচ্ছা, একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তো, এইসব বাহ্যিক আবরণ ও বেশভূষা কি কম? এসবের কি কোনো মূল্য নেই? এগুলো কি ধেয়ে আসা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো নয়? সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ নয়? সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় নয়? নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা ধরে রাখার সফল প্রয়াস নয়? যারা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবাধ প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, তাদের সামনে এ কি নতুন বার্তা নয়?

আমি বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলছি, আমি এমন অনেক আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের চিনি; যাদের যুবকদের পোশাক নিয়ে বেশ আপত্তি আছে। অথচ এগুলো বড়ো কোনো বিষয় নয়। কেবল সুন্নাহর অনুসরণ করেই তারা এমন পোশাক বেছে নিয়েছে। আর এই পোশাকগুলো ভদ্রতা ও আভিজাত্যের পরিচায়ক।

অথচ এই ব্যাপারগুলো পাশ্চাত্য সমাজেও অহরহ দেখা যায়। এতে কারও কোনো বিকার নেই, উচ্চবাচ্য নেই। সবাই এটাকে স্বাভাবিকভাবেই দেখছে। যার যার একান্তই ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার মনে করছে। তাই এতে হস্তক্ষেপ করাটা তারা অন্যায় মনে করে। অধিকার হরণ ভাবে। তাদের অনেক যুবকই লম্বা লম্বা দাড়ি রাখছে। লম্বা চুল রাখছে। আবার কেউ কেউ নানাভাবে কেটেকুটে দাড়ি রাখছে। কেউ পাশ দিয়ে একেবারে 'সেভ' করে ফেলছে আর নিচ দিয়ে রাখছে। কই এ নিয়ে তো কোথাও কোন শোরগোল দেখা যায় না। আর এখানে প্রাচ্যে এ নিয়ে কথার কোনো শেষ নেই। কেউ যদি দাড়ি রাখে, লম্বা জামা পরে, তাহলে কিছু মানুষের উৎসাহ বেড়ে যায়। কৌতূহল জন্মাতে থাকে। নানা কথা না বললে তাদের ঘুম হারাম হয়ে যায়। এটা পাড়ার আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

আর মেয়েদের পোশাক নিয়ে তো কথাই নেই। কেন তারা হিজাব পড়তে যাবে? কেন তাদের নেকাব পড়ে থাকতে হবে? এগুলো পশ্চাৎপদতার পরিচয় ও স্থবিরতা! এন্তার নানা কথা বলতে থাকে।

অথচ এরাই মুখে মুখে ব্যক্তি স্বাধীনতার বুলি কপচায়। অন্যের মতের স্বাধীনতার কথা বলে। কেউ যদি ছোটোখাটো ও আঁটসাঁট পোশাক পরে, তবে তা মুক্তমনা ও প্রগতির পরিচয়। তা তার অধিকার। অথচ হিজাব হয়ে যায় পশ্চাৎপদতা! সেলোকাস!

বিপ্লবের কারণ

আচ্ছা, এই বিপ্লবের কারণ কী? এই বিপ্লবের বিকাশের পেছনে কী কী বিষয় কাজ করেছে?

এই নিয়ে কম লেখালেখি হয়নি। অনেক লেখকই নানাভাবে এর বিচার-বিশ্লেষণ করেছে, নানা দিক তুলে ধরেছে। প্রত্যেকেই আপন আপন মত

ও দর্শন অনুসারে ব্যাখ্যা করেছে। প্রত্যেকের লেখায় আপন ঘরানা ও বলয়ের ছাপ রয়েছে। আপন আপন জায়গা থেকে প্রতিটি ঘটনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে।

কেউ কেউ এই বিপ্লবকে নিছক বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা করেছে। সমাজের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সমস্যা ও সংকটকে এর জন্য দায়ী করেছে। এরা ইতিহাসের প্রতিটা ঘটনার পেছনে অর্থনীতি খুঁজে বেড়ায়। সময়ের পরিবর্তন ও বাঁক বদলেও এরা অর্থনীতি দেখে। এমনকী নবুয়তের আবির্ভাব ও আসমানি কিতাবের অবতরণের পেছনেও এরা অর্থনীতির ভূমিকা দেখে। এটাই তাদের মজ্জাগত অভ্যাস। আর যে আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা এবং আসমানি কিতাবের প্রতি ঈমান আনে না, সে এই অভ্যাস থেকে ফিরে আসতে পারে না।

অনেকে আত্মিক কারণ খুঁজে বেড়ায়। কারণ, এই বিপ্লব গড়ে উঠেছে ১৯৬৭ সালের বিপর্যয়ের পর। অনেকের মতে যা পরাজয় ছিল। আর এই বিপর্যয়ের পর ইজরাইল ফিলিস্তিনের আরও অনেকটা অংশ দখল করে নেয়। গোলান মালভূমি ও সিনাই উপত্যকাও এর অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের মাঝে যতদিন সুস্থ বিবেক ও সুস্থির মন থাকবে, ততদিন এই বিপ্লবের অবিনাশী চেতনা বিবেকের দুয়ারে করাঘাত করবে, মনকে দোলা দেবে। অভাবনীয় জাগরণের সৃষ্টি করবে।

মানুষের প্রকৃতি-ই হলো যখনই সে কোনো বিপদে আক্রান্ত হয়, যখনই কোনো দুর্যোগের ঘনঘটা দেখে, তখনই সে মহান আল্লাহর কাছে ফিরে আসে। কাকুতি-মিনতি করে। খোদার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়– এমনকী সে মুশরিক হলেও। এই হলো মানুষের চরিত্র। আদিম অভ্যাস। মানুষের এই চরিত্র কুরআনে অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে।

মানুষের স্বভাবই হলো, যখনই কোন জাহাজ ঝঞ্ঝাবায়ুর মুখে পড়ে, সাগর ফুঁসে উঠে, অতিকায় সব ঢেউয়ের মুখে পড়ে, তখনই মানুষ আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। পরম নিষ্ঠা ও আগ্রহভরে খোদাকে ডেকে যায়। আর সেটাই ঘটেছে ফিলিস্তিনিদের সাথে। ১৯৪৮ সালের দুর্যোগের পর ১৯৬৭ সালে আরেকটা দুর্যোগ মুসলিম মানসকে খোদার পথে ঠেলে দেয়।

মুসলিম অস্তিত্বে কাঁপন তোলে। আল্লাহর দ্বীনের সুবিশাল প্রান্তরে এনে সমবেত করে। প্রতিরোধ গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা জোগায়।

ফিলিস্তিনের ১৯৬৭ সালের দুর্যোগ ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দেশে-বিদেশে এ নিয়ে লেখালেখি হয়। অনেক বাম আরব লেখকরাও এ নিয়ে লেখালেখি করেছে। আপন আপন মত তুলে ধরেছে। এসব লেখাজোখার মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত ও বিদঘুটে কথা হলো, এক শাসক নাকি ধেয়ে আসা জায়োনবাদী প্রবল স্রোতকে থামিয়ে দিতে এই বিপ্লব উসকে দিয়েছে! তার প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে এই বিপ্লব চলেছে– এমন কথাও মিশরে হয়েছে!

অবাক হচ্ছেন? হাসি চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছে? এখানেই শেষ নয়। তারা আরও দাবি করে, তাদের কলমে আপামর জনতার কথা ফুটে উঠেছে! একটা ব্যাপার আমার কিছুতেই বুঝে আসে না যে এসব লোকেরা কী করে ভাবল, যে আন্দোলনে সমগ্র মুসলিম জাতিসত্তা এসে মিশেছে, সেখানে কী করে পুঁচকে শাসকের প্রণোদনা থাকতে পারে? মানুষের চিন্তা-চেতনা ও সমগ্র অনুভূতিজুড়ে যে বিপ্লবের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে, তার বিকাশের জন্য কি কোনো শাসকের ঠুনকো আনুকূল্যের দরকার আছে? আর ইসলামি বিপ্লব তো সমগ্র মুসলিম জাতিসত্তার মর্মমূল থেকে উঠে আসা এক আন্তর্জাতিক আন্দোলন। তা কী করে মসনদলোভী শাসকের প্রশ্রয়ে জ্বলে উঠবে!

আচ্ছা, ধরেই নিলাম এই আন্দোলন কোনো শাসকের ইশারায় হয়েছে। তাহলে ওই শাসক তো আন্দোলনের চাকা টেনে ধরতে পারত, যেমনটা শুরু করেছিল। যে গড়তে পারে, সে তো ভাঙার ক্ষমতাও রাখে; বরং ভাঙা গড়ার চেয়ে সহজতর!

হায় খোদা! তাহলে মিশর ছাড়া সমগ্র মুসলিম দেশগুলোতে এই আন্দোলন কে শুরু করেছে? অন্যান্য আরব দেশুগুলোতে কারা করেছে? মুসলিম বিশ্বের বাইরে এই দাবানল কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছে?

হ্যাঁ, কখনো কখনো কোনো কোনো শাসক হয়তো এই বিপ্লবের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করেছে বা কিছুটা আনুকূল্য দিয়েছে, তবে তা আপন স্বার্থ-চরিতার্থ করতে। নিজের মতলব হাসিল করতে। প্রতিপক্ষকে দুর্বল ও ঘায়েল করতে। কিছুতেই এই আন্দোলনকে ভালোবেসে নয়; বরং নিজের

শত্রুকে দমন করার জন্যই সে আদাজল খেয়ে নেমেছে। কখনো তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, কখনো ব্যর্থ হয়েছে। কখনো তার লক্ষ্য আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে এক হয়েছে, আবার কখনো হয়নি। সে নিজের প্রয়োজনে আন্দোলনকে ব্যবহার করতে চেয়েছে। আন্দোলনের প্রয়োজনে কখনোই তাকে কাছে পাওয়া যায়নি! আর এতেই বামরা চটে গেছে!

বামদের অসন্তোষের কারণ আছে। হয়তো কোনো শাসক কোনো সময় ইসলামি আন্দোলনকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছে, প্লাটফর্ম দিয়েছে; যেমনটা ডান-বাম সব সংগঠনকে সাধারণত দেওয়া হয়। আর এতে বামরা বেজায় চটে গেছে। অথচ বাম সংগঠনগুলোকে অনেক বছর ধরে দুধ-কলা দিয়ে পোষা হয়েছে। পরম যত্নে আগলে রাখা হয়েছে। ধীরে ধীরে তারা এ দেশে শিকড় গাঁড়ে। একসময় দেশের মিডিয়ার ওপর হামলে পড়ে। মিডিয়ার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। নিজেদের স্বার্থে তাদের ব্যবহার করে। মিডিয়ার সহায়তায় নিজেদের মতাদর্শ প্রচার করে। ইসলামের ওপর একের পর এক আঘাত করে যায়। সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলাম ও ইসলামি ব্যক্তিত্বদের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে। দ্বীনের ব্যাপারে বিষোদ্‌গার করে। পক্ষান্তরে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার কেউ নেই, প্রশ্ন তোলার কেউ নেই। ফলে তাদের পথচলা অবাধ-স্বাধীন ও বাধা-বিঘ্নতাহীন!

হ্যাঁ, এতটুকুতেই তারা বেজায় চটে গেছে। তাদের গা জ্বালা শুরু হয়েছে। কারণ, অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানে, এটাই একমাত্র বিপ্লব যা মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং মন ও মগজের সাথে যায়। তাই যেকোনো উপায়ে এই বিপ্লবকে দমন করতে হবে। যেকোনো মূল্যে এর টুঁটি চেপে ধরতে হবে– প্রয়োজনের আগুনের গোলা মেরে বা অস্ত্র ব্যবহার করে! মোটকথা যেকোনো উপায়েই সমগ্র জাতিকেই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে।

কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে এই বিপ্লব হয়তো ধামাচাপা দেওয়া যাবে, কিন্তু বিলীন করা যাবে না। দুর্বল করা যাবে, কিন্তু কিছুতেই শেষ করা যাবে না!

ইসলামি আন্দোলনের একমাত্র চাওয়া হলো, তাকে অবাধে স্বজাতির মাঝে কথা বলার অধিকার প্রদান করা। জনসাধারণকে শক্তিশালী করতে সুযোগ দেওয়া। ইসলামের মূল রূপে আহ্বান করার প্লাটফর্ম দেওয়া।

তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতিহত করার অধিকার দেওয়া। এটা আন্তর্জাতিক সনদ অনুযায়ী মানবাধিকারের অংশ। আঞ্চলিক সনদগুলোও এ কথা বলে। তারা যে গণতন্ত্রের বুলি কপচায়, সে গণতন্ত্রেও এ অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে!

আচ্ছা, এই বাম লোকগুলো গণতন্ত্রের ঢাল কি নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করে? গণতন্ত্র কি অন্য কারও জন্য প্রযোজ্য নয়? তারা আসলেই দেউলিয়া! পাশ্চাত্যের তথাকথিত মুক্তচিন্তার কাছে তারা পরাধীন। স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন। সব দলের, প্রত্যেক ঘরানা ও মতাদর্শের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, আন্দোলন ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা আছে। একমাত্র ইসলামি দলগুলোর এইসব স্বাধীনতা নেই!

আরও অবাক কাণ্ড হলো, এই বাম ঘরানার লোকেরা নিজেদের বেশ বিশ্লেষণক্ষমতাসম্পন্ন মনে করে। তারা ইসলামি বিপ্লবকে মনে করে দুর্লভ ঘটনা। পার্থিব রীতিনীতির পরিপন্থি ঘটনা। মানবসমাজের সাথে খাপ খায় না।

তাদের চাওয়া হলো, 'মুসলিম উম্মাহ স্থবির হয়ে থাকবে। নিজেদের চেতনা ও আত্মপরিচয় ভুলে যাবে। তাদের মাঝে জাগরণ শোভা পায় না। বেহুশ হয়ে পড়ে থাক, সম্পূর্ণ নির্জীব ও নীরব।' হ্যাঁ, যদি জেগে ওঠে, যদি তার মাঝে প্রাণের পরশ লাগে, তবে তা হতে হবে অন্য কিছুর জন্য, অন্য কিছুর মাধ্যমেই। কিছুতেই ইসলামের জন্য জেগে উঠুক– এটা তারা চায় না।

শপথ করে বলছি, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পুরোটাই বাতিল। এই মহান জাতিকে, মুসলিম উম্মাহকে, শুধু ইসলামের জন্য এবং ইসলামের মাধ্যমেই জেগে উঠতে হবে। এই জেগে উঠাটাই মুসলিম উম্মার সহজাত প্রকৃতি। আমাদের জ্ঞান ও ঐতিহ্যের ব্যাপারে যারা খোঁজখবর রাখে, তাদের কাছে আলিমদের অভিমত অজানা নয়– 'সহজাত ও মৌলিক ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা যায় না। তার হেতু খুঁজতে যাওয়া বোকামি। কারণ, মুসলিম বিশ্ব দীর্ঘ সময় আত্মপরিচয় বিস্মৃত হয়ে থাকতে পারে না। স্বকীয়তা বিবর্জিত হতে পারে না। এই উম্মাহ ইসলামের প্রতি ঈমান এনেছে। সকাল-সন্ধ্যা কুরআনের তিলাওয়াত করে। কিছুতেই নিজের স্মৃতি থেকে রাসূল ﷺ-এর জীবন এবং ইসলামের বীর সেনানীদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনি ভুলতে পারে না। তাই কিছুতেই এই জাতি বেঘোর ঘুমে বেশি দিন থাকতে পারে না।

তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বভাব মুসলমানদের শোভা পায় না। ইসলাম এ জাতিকে সর্বদাই জ্ঞানের পথে আহ্বান করে। কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। গভীর চিন্তা ও গবেষণার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। জিহাদ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। অতি দৃঢ়তার সাথে ভরসা দিয়ে বলে– নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের সাথে থাকে। আর উত্তম পরিণতি হবে মুমিনদের। সত্যের বিজয় হবে। পরাজয় মিথ্যার, বাতিলের। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'যা পানির বুদবুদ তা বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যাবে। আর যা মানুষের কল্যাণ করে, তা পৃথিবীতে স্থায়ী হবে।' সূরা রা'দ : ১৭

এই জাতির প্রকৃতিই হলো, তারা কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা মেনে চলবে। ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করবে। কিছুতেই ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার ওপর একত্রিত হবে না। এ জাতির মাঝে সর্বদাই একটি দাওয়াতি কাফেলা থাকবে। তারা মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করবে। সৎ পথের আদেশ দেবে। খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বারণ করবে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য জান কুরবান করবে। বিজয় আসা পর্যন্ত লড়ে যাবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> 'আর আমি যাদের সৃষ্টি করেছি, তাদের মাঝে একটা দল আছে যারা সৎ পথের দিকে ডেকে যায় এবং সততার সাথে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।' সূরা আ'রাফ : ১৮১

রাসূল ﷺ বলেন–

> 'আমার উম্মতের মাঝে সর্বদাই সত্যের ওপর অটল একটা দল থাকবে, তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না; এমনকী কিয়ামত আসা পর্যন্ত তারা তার ওপর অটল থাকবে।' বুখারি ও মুসলিম

তিনি বলেন–

> 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা প্রতি একশো বছরে এই জাতির মাঝে এমন একজনকে পাঠাবেন, যে নতুন করে দ্বীনের জাগরণ সৃষ্টি করবে।' আবু দাউদ

ইতিহাস বলে, নিশ্চয় এই জাতিকে অনেক বড়ো বড়ো বিপর্যয় আক্রমণ করেছে। এই জাতির পথচলার একেবারে উষালগ্ন থেকেই এ ব্যাপারে নানা কথা ভেসে আসে। মুমিনরা শত শত বিপদের মুখোমুখি হয়েছে। বিপর্যয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে কাহিল হয়েছে। কিন্তু এই জাতি ঠিকই অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। বাইরের যুদ্ধের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। বিপর্যয়কে বিজয়ে রূপ দিয়েছে। দুর্বলতা ও অক্ষমতার ভেতর থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছে। বিচ্ছিন্নতার মাঝে ঐক্য সাধন করেছে। বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে তৈরি হয়েছে একটি দেহাবয়ব।

ইতিহাস আরও বলে– যখনই কোনো যোগ্য ও লড়াকু ব্যক্তি ইসলামের নাম নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনই বিশাল বিপ্লব সূচিত হয়েছে। সেই বিপ্লবের ছোঁয়ায় খোদার নাম উচ্চকিত হয়েছে। তারই পতাকাতলে এসে মিলেছে সমগ্র জাতি!

তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রিদ্দার যুদ্ধে; প্রথম খলিফার যুগে। যখন আরবের সমস্ত গোত্র ইসলাম ত্যাগ করেছে। মিথ্যাবাদী ভণ্ড নবিদের অনুসরণ করেছে। আর ইসলাম সংকুচিত হয়ে পড়েছিল মক্কা ও মদিনায়। আবার ইমাদ উদ্দিন জিংকি, নুর উদ্দিন জিংকি, মাহমুদ শহিদ এবং সালাউদ্দিন আইয়ুবির যুগেও ক্রুসেডের যুদ্ধে এমন অহরহ দৃষ্টান্ত আছে।

ইতিহাসে এমন আরও ঘটনা আছে। তাতারিরা সমগ্র মুসলিম বিশ্ব পদানত করেছিল। তাদের হাতে পতন হয় বাগদাদের, আব্বাসীয় খিলাফতের। সমগ্র মুসলিম জাহানে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। চরম অসহায়তার মধ্যে পড়ে যায় প্রতিটি মুসলিম। ঠিক তখনই কিছুদিনের মধ্যে মুসলিম বিশ্ব ঘুরে দাঁড়ায়। তার অস্তিত্বের জানান দেয়। দুই-দুইবার তাতারিদের হারিয়ে দেয়। সামরিকভাবে তাদের পরাজিত করে। এক ঐতিহাসিক যুদ্ধে সাইফুদ্দিন কুতুজের অভাবনীয় সমর-কৌশলের কাছে তারা গো হারা হারে। আর সেই যুদ্ধ আইনে জালুতের যুদ্ধ নামে এখনও ইতিহাসের পাতায় আলো ছড়ায়। ৬৫৬ হিজরিতে বাগদাদের পতনের পর মাত্র দুই বছর পর ৬৫৮ হিজরির রমজানের ২৫ তারিখে 'আইনের জালুতে' তাতারিদের পতন হয়।

শুধু সামরিকভাবেই তাদের পদানত করেনি; বরং তাদের ভেতরটাকেও পদানত করেছে– দখল করে নেয় তাদের ভেতরটাকেও। ইসলামের সৌন্দর্যে তারা মুগ্ধ হয়ে যায়। ইসলাম তাদের মনোজগৎ অধিকার করে নেয়। একসময় তারা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে একত্রিত হয়। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিজয়ীরা বিজিত অঞ্চলের পরাজিত দলের ধর্ম গ্রহণ করেছে– এমন নজির আর কোথাও নেই। এর আগে পরে এমন ঘটনা অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে ঘটেনি। আর এটাও ইসলামের শত শত মোজেজার একটি!

মুসলমানদের সমস্ত স্বাধীনতাযুদ্ধে ও মুক্তি-সংগ্রামে ইসলামই সবচেয়ে বড়ো অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। মূল কমান্ডারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। উপনিবেশের বিরুদ্ধে ইসলামই মূল ভূমিকা পালন করেছে।

দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন

ইসলামি বিপ্লবের কারণ ও তার উপকরণ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটা বাস্তবতার মুখোমুখি হই। আর তা কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না। সেটা হলো– আমরা আধুনিক ইসলামি বিপ্লবের যে প্রভাব ও দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি, তা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এটা কোনো আগাছা নয় যে একা একা জন্ম নিয়েছে। কোনো নেতা কিংবা বিপ্লবী ছাড়াই এই বিপ্লব সূচিত হয়নি– যেমনটা অনেকে ভাবে।

এই জাগরণ বা বিপ্লব মূলত যুগ যুগ ধরে চলে আসা ইসলামি আন্দোলনেরই সম্প্রসারিত রূপ। এটা জ্ঞান ও চিন্তার কেন্দ্র। অনেক আগেই এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মাঝখানে এই আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়েছে। কিছুটা এখনও টিকে আছে। মানুষের আচারে ও লোকাচারে এর উপস্থিতি টের পাওয়া যায়।

সত্যের পূজারি মানুষের ঘামের বিনিময়ে এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তারা আপন আপন জায়গা থেকে দ্বীনের সংস্কার ও জাগরণের চেষ্টা করেছেন। ইসলামি ভূখণ্ডে নির্দিষ্ট কোনো অংশে বা একাধিক অংশে ইসলামি জাগরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইসলামের বাস্তবায়ন ও প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াস চালিয়েছেন। মানুষের জীবনাচার, চিন্তা এবং বিশ্বাসে ইসলামকে বিম্বিত করার কাজ করেছেন।

এই সংস্কারক ও নিবেদিত প্রাণ মানুষগুলো ইতিহাসকে আলোকিত করেছেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন– আরব উপদ্বীপের মহান সংস্কারক, সালাফি দাওয়াতের প্রতিষ্ঠাতা এবং হাম্বলি মাদরাসার কীর্তিমান ছাত্র

শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (মৃত্যু : ১৭৯২ খ্রি.)। এই মহান সংস্কারকের দাওয়াতের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সৌদি আরব। তাদের মাঝে আরেকজন হলেন লিবিয়ার মহান শাইখ মুহাম্মদ বিন আলি আসসানুসি (মৃত্যু : ১৮৫৯ খ্রি.)। আরও আছেন সুদানের বিদ্রোহী মুজাহিদ ও দায়ি, সুদানের সমগ্র জনতা যার ডাকে জেগে উঠেছিল, ইংরেজ উপনিবেশের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়ে বিজয় ছিনিয়ে আনা সেনাপতি, নীলনদের দক্ষিণে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা মুহাম্মদ আহমদ আল মাহদি (মৃত্যু : ১৮৮৫ খ্রি.)। অন্যজন হলেন জামাল উদ্দিন আফগানি (মৃত্যু : ১৯০২ খ্রি.)। জামাল উদ্দিন আফগানি চিন্তার জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। মুসলিম বিশ্বে বিপ্লবের বীজ বপন করেছেন।

এ ছাড়াও আছেন আব্দুর রহমান কাওয়াকিবি (মৃত্যু : ১৯০২ খ্রি.)। তিনি ছিলেন মহান সংস্কারক ও পর্যটক। তিনি রাজনৈতিক দাসত্ব ও নৈরাজ্য থেকে মুক্তির ডাক দিয়েছেন। তার দুটি কিতাব বেশ সাড়া জাগিয়েছে : একটি হলো *তাবায়েয়ুল ইসতিবদাদ* এবং অন্যটা হলো *উম্মুল কুরা*।

এদের মাঝে যার কথা উল্লেখ করতেই হয়, তিনি হলেন জামাল উদ্দিন আফগানির ছাত্র মুহাম্মদ আবদুহু (মৃত্যু : ১৯০৫ খ্রি.)। তিনি জামাল উদ্দিন আফগানির সাথে 'উরওয়াতুল উসকা'র সম্পাদনা করেন। তিনি মানুষের মধ্যে সংস্কার ও জাগরণের সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষা ও চিন্তার গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

মুহাম্মদ আবদুহুর ছাত্র, সাথি এবং জ্ঞানের বাহক সায়্যিদ রশিদ রেজাও অন্যতম। তিনি তাঁর শাইখের কাছে স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার পাঠ নেন। প্রথাগত আচার ও স্থবিরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে ডুবে যান। সালাফি বিদ্যালয়ে প্রাণ সঞ্চার করেন। প্রাচীন ও আধুনিকের মাঝে সমন্বয় সাধন করেন। বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান এবং শরয়ি জ্ঞানের মাঝে তুলনামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি নতুন সালাফি আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেন। তার সম্পাদনায় ছাপা হতো বিখ্যাত পত্রিকা *আল মানার*। তার বিখ্যাত তাফসির হলো *তাফসিরুল মানার*। এ ছাড়াও আরও নানা বই রয়েছে, যেগুলো সেই সময় বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। এই মহান সংস্কারক ১৯৩৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

এই কাফেলার আরেকজন মহান সংস্কারক হলেন বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি। তিনি ছিলেন এক অবিচল মর্দে মুজাহিদ। কামাল আতাতুর্কের চাপিয়ে দেওয়া ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে দুর্বার ঈমানি আন্দোলন গড়ে তোলেন। তুর্কি ভাষাতেই তুর্কিদের মাঝে ঈমানের আবেগ ও জজবা সৃষ্টি করেন। ঈমানের নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করেন, যার দাবানল গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই কাফেলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মনীষীদের অন্যতম হলেন হাসানুল বান্না। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ছিল কুরআন। ব্যাপক আকারে দাওয়াতি কার্যক্রম চালান। ইসলামের সর্বজনীনতা, ভারসাম্য, খোদামুখী প্রকৃতি ও বাস্তবধর্মিতা তুলে ধরেন। ইলম ও আমলের মাঝে, চিন্তা ও বিপ্লবের মাঝে এবং তারবিয়াত ও জিহাদের মাঝে আশ্চর্যরূপে সমন্বয় সাধন করেন। সালাফিদের আকিদা এবং সুফিদের আধ্যাত্মিকতার মাঝে ভারসাম্য রেখে চলেছেন। সামগ্রিক ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছেন। ইসলামই ছিল দ্বীন, জীবনব্যবস্থা, রাষ্ট্র, ইবাদত, নেতৃত্ব, কুরআন এবং তরবারির নির্ণায়ক। অভ্যন্তরীণ অনাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়েছেন তিনি। বাইরের উপনিবেশ এবং জায়োনবাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছেন। নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলেছেন। তাদের মাঝে কুরআনের অবিনাশী চেতনা ও রাসূলের আদর্শ সৃষ্টি করেছেন। এই প্রজন্মের চলার পাথেয় ছিল কুরআনুল কারিম। ঠিকে থাকার বাহন ছিল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করা ছিল দীর্ঘ জীবনের লালিত স্বপ্ন।

তাঁর হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠান ছিল অধুনাকালের সবচেয়ে বড়ো প্রতিষ্ঠান। তিনি সামগ্রিক ইসলামের স্বপ্ন দেখেছেন। গোটা দুনিয়াজুড়ে তাঁর বই, শিষ্য এবং শিষ্যের শিষ্যরা ভোরের আলোর মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে তাদের ওপর নেমে এসেছিল অমানুষিক নির্যাতন। নির্যাতন-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের অনেকে নানা দেশে হিজরত করে। প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়ে। তবে যেখানেই তারা গিয়েছেন, দাওয়াত ও বিপ্লবের শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

এইসব মহান সংস্কারকদের মাঝে প্রাতস্মরণীয় একজন হলেন বিংশ শতাব্দীর মহান ইসলামি চিন্তানায়ক, গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আল্লামা আবুল আলা আল মওদূদী। এই মহান মনীষীর বিশ্লেষণ ক্ষমতা ছিল অতি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার কঠোর সমালোচক ছিলেন তিনি।

যুক্তি ও প্রমাণের নীরিখে ইসলামের প্রতি মানুষকে ডেকে গিয়েছেন। অনেক কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর এই রচনাগুলো পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের মুখে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। সুন্নাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়ে যায়। নতুন নবুয়তের দাবিদারদের বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করে। কবরপূজারি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করে। স্থবিরতা ও প্রথাগত চিন্তাকে আঘাত করে।

তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা। এই মহান মনীষীর দাওয়াতের রীতি ও পদ্ধতির সাথে হাসানুল বান্নার দাওয়াতের রীতিনীতির মিল পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়নি। তবে দুই দলের কর্মীদের মাঝে সাক্ষাৎ হয়েছে। নানা ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করেছে। বিশেষত ইউরোপ, আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। এই মহান মনীষী ১৯৭৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

এই কাফেলার আরও একজন মহান সংস্কারক হলেন আব্দুল হামিদ বিন বাদিস। তিনি গোটা জীবন কুরআনের তাফসির ও কুরআনি শিক্ষার বাস্তবায়ন করে গেছেন। সালাফিদের বিশুদ্ধ এবং সুফিদের আধ্যাত্মিকতার দিকে মানুষকে আহ্বান করে গেছেন। চিন্তা-চেতনার স্থবিরতার বিরুদ্ধে লড়েছেন। আকিদায় বিকৃতি এবং জীবনাচারে বক্রতার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তারবিয়তের মাধ্যমে জ্ঞানের সেবা করেছেন। জাজায়েরে জাময়িতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা এবং *শিহাব* পত্রিকার সম্পাদক। আর এই পত্রিকা জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছে। পথহারাদের সুপথে এনেছেন। এই মহান মনীষী ১৯৪০ সালে মারা যান।

এই কাফেলার আরও একজন মহান মনীষী হলেন মুস্তাফা আসসিবায়ি। বিশিষ্ট দায়ি ও ফকিহ। অবিচল মুজাহিদ। আলোকিত হৃদয়ের অধিকারী। বাক্‌চাতুর্যপূর্ণ ভাষা ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী। তিনি একাধারে সুন্নাহর বিরোধী চক্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং তাদের টুঁটি চেপে ধরেছেন। সিরিয়ায় ইসলামি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। *হাজারাতুল ইসলাম* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি ১৯৬৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

এদের মাঝে আরেক মহান সংস্কারক ছিলেন বিশিষ্ট দায়ি ও শহিদ সায়্যিদ কুতুব। দৃঢ়চেতা অবিচল মর্দে মুজাহিদ। আল্লাহর পথে শত কষ্ট সহ্য করেছেন,

কিন্তু কিছুতেই দমে যাননি। ভেঙে পড়েননি। দুর্বল হননি, মচকে যাননি। আপন চিন্তা ও ভাবনার প্রতিফলনের জন্য জীবনবাজি রেখেছেন। তাঁর কলম ছিল অত্যন্ত ক্ষুরধার। ভাষা ছিল ঐশ্বর্যময়। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো *আদালাহ*, *জিলাল*, *তাসওয়িরুল ফান্নি*, *মা'আলিম*। এ ছাড়াও তাঁর অনেক কালজয়ী রচনা রয়েছে। তাঁর প্রতিটি বই গোটা মুসলিম বিশ্বে বেশ সমাদৃত হয়েছে। প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই ক্ষণজন্মা মহামনীষী ১৯৬৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

এই হলো যুগে যুগে অভাবনীয় প্রভাব রেখে যাওয়া উল্লেখযোগ্য কিছু ইসলামি চিন্তাবিদ ও দায়িদের সামান্য পরিচিতি। তাঁদের প্রত্যেকেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব রেখে গিয়েছেন। পৃথিবীর নানা ভূখণ্ডে অল্পবিস্তর ইসলামের আন্দোলনের বাতাস বইয়ে দিয়েছেন। এই আন্দোলন কখনো দীর্ঘদিন চলেছে, আবার কখনো অল্প সময়ে স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

এই মহান বিপ্লবী সংস্কারকরা সবাই সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাই তাঁদের কাজের ধরন ও পদ্ধতির মাঝে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। তবে কাজে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। কোনো মানুষই তো ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাঁরা আপন আপন জায়গা থেকে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। কখনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আবার কখনো তাঁদের সিদ্ধান্তে বা কর্মপন্থায় কিছুটা বিচ্যুতি ছিল। সবক্ষেত্রে তাঁরা আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান পাবেন; ভুল হোক বা শুদ্ধ হোক– আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান রয়েছে।

ইসলামের পুনর্জাগরণে তাঁদের চিন্তা ও কাজের, তাঁদের শিষ্যদের এবং রীতিনীতির এক বিশাল প্রভাব রয়েছে– তার ফল আমরা ভোগ করছি।

আমরা কিছুতেই তাঁদের বিরল সাহসিকতার কথা ভুলতে পারি না। ত্যাগ, দৃঢ়তা ও আত্মোৎসর্গের যে বিরল দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করেছেন, তা কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না। ইসলামি আন্দোলনের মহান কর্মীরা আল্লাহর সঙ্গে করা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। কেউ কেউ বেঁচে আছেন, আবার কেউ কেউ আল্লাহর সান্নিধ্যে পাড়ি জমিয়েছেন। কাউকে কাউকে হয়তো চিনি। সবার মাঝে সত্যের প্রতি ব্যাকুলতা দেখেছি। কল্যাণকামিতা ও ন্যায়ের জন্য উৎকণ্ঠা দেখেছি। যেমন : মহান দায়ি ও ফকিহ আব্দুর কাদের আওদা,

বিশ্বস্ত মুজাহিদ ও মহান আলিম মুহাম্মদ ফারাগলি, শহিদ ইবরাহিম তায়্যিব, ইউসুফ তালয়াত, আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইল, মুহাম্মদ ইউসুফ হাওয়াস। দৃঢ়চেতা মনীষী এবং ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দ্বিতীয় প্রধান হাসান হাদবি। এমন আরও অনেক মনীষীর বীরত্বপূর্ণ কীর্তি ও অসম সাহসিকতার গল্প কিছুতেই ভোলা যাবে না। এমন আরও অনেকেই জীবন-যৌবন আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করেছেন। তাঁদের এই ত্যাগ ও তিতিক্ষা ঈমানি চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। ইসলামি সংগ্রামকে বেগবান করেছিল।

ঠিক অভিন্নরূপে আধুনিক যুগে ইসলামের নতুন আন্দোলনের নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। তার প্রভাব কারও কাছেই অজানা নয়। আধুনিক যুগের জিহাদি প্রেরণারও নানামুখী প্রভাব রয়েছে। যেমন : জাজায়েরে আব্দুল কাদের (রহ.)-এর সংস্কার আন্দোলন। সুদানের মহান নেতা মুহাম্মদ আহমদ মাহদি। মরক্কোর আব্দুল করিম কিতাবি। লিবিয়ায় ওমর আল মুখতার। ফিলিস্তিনের ইজ্জুদ্দিন কাসসাম এবং আমিন হুসাইনি।

জিহাদ ও আমলের ময়দানের পাশাপাশি চিন্তা, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের অঙ্গনেও কিছু মানুষ অবিরাম কাজ করে যায়। তাঁরা মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তুলেছে। অনুভূতিতে নাড়া দিয়েছে। বোধের জগতে জাগরণ সৃষ্টি করেছে। উপনিবেশের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ করেছে।

এই অঙ্গনে কাজ করা ক্ষণজন্মা মনীষীদের একজন হলেন ভারতীয় উপমহাদেশের মহান কবি ড. আল্লামা ইকবাল। যার চিন্তা মানুষের বোধের জগতে বিপ্লব সূচিত করেছে। হৃদয়কে জাগিয়ে তুলেছে।

আরেকজন হলেন সাকিব আরছালান। তিনি ছিলেন একাধারে বরেণ্য সাহিত্যিক, সংস্কারক, ইতিহাসবিদ এবং ইসলামের রক্ষক। তাঁর অসাধারণ প্রবন্ধ ও কালজয়ী গ্রন্থগুলো এখনও পাঠকমহলে ব্যাপক গ্রহণযোগ্য।

অন্যজন হলেন মুস্তফা সাদেক রাফিয়ি। মহান আরবি সাহিত্যিক। তাঁর কলম সারাজীবন সত্যের পক্ষে লড়ে গেছে। বাতিল ও অসত্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ইসলামের পক্ষে কলমযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। পাশ্চাত্য প্রভাবিত ইসলামবিরোধী বিকৃত রচনার দাতভাঙা জবাব দিয়েছে। তাঁর লেখাগুলো এখনও সত্যের পক্ষের বাহন হয়ে পাঠকসমাজের হৃদয় জয় করছে।

এই চিন্তাশীল কাফেলার সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী লেখক হলেন আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ। তিনি সারা জীবন ইসলামের পক্ষে কলম চালিয়েছেন। ইসলাম বিদ্বেষীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সমাজতন্ত্রের দাওয়াত ও আহ্বানকে নাকচ করেছেন। তাঁর লেখায় ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস নতুন জীবন পেয়েছে।

এদের অন্যজন হলেন মালেক বিন নবি। নতুন সভ্যতা নির্মাণ করাই ছিল যার ধ্যান-জ্ঞান। তাঁর গভীর চিন্তাশক্তি এবং তীক্ষ্ম বিবেচনাবোধ তাঁকে অন্যদের মাঝে স্বাতন্ত্র্যবোধ দান করেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হলো *আজ জাহিরাতুল কুরআনিয়া* ও *শুরুতুন নাহদা*।

এই সারির আরেকজন হলেন বিশিষ্ট দায়ি ও চিন্তাবিদ *নিজামুল ইসলাম* এবং আরও অনেক কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা মুহাম্মদ মোবারক। তাদের মতো এমন আরও অনেক বরেণ্য সাহিত্যিক, পণ্ডিত, সংস্কারক রয়েছেন, যারা আপন আপন জায়গা থেকে আপন আপন হাতিয়ার দিয়ে ইসলামের জন্য কাজ করে গেছেন। কেউ কলম দিয়ে লড়েছেন, কেউ বক্তব্য দিয়ে জাতিকে সতর্ক করেছেন।

যুগে যুগে যারা বিপ্লব আনতে প্রণোদনা জুগিয়েছে– এমন দল, আন্দোলন এবং তার প্রভাবের কথা আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হব না। আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি, দলের পথচলা এসব আমাদের বিবেচ্য নয়। মূল ব্যাপার হলো– ইসলামের জাগরণে তার ভূমিকা রয়েছে কি নেই! সেইসঙ্গে কিছুতেই ভুলে গেলে চলবে না, সমস্ত ইসলামি দলের মূলে হলো ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অবদান!

এই দলগুলোর মাঝে অন্যতম দাওয়াতে তাবলিগ। আরব-অনারব হাজারো পথহারা পাপিষ্ঠ বান্দাদের হাত ধরে ধরে দ্বীনের পথে এনেছে এই দল। মসজিদ ও নামাজের পথে এনেছে। তওবার পথে এনেছে। সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির পথে এনেছে।

আরেকটা দল হলো জিহাদি দল, যারা ঈমানের প্রকৃত শক্তিতে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের জন্য উৎসাহিত করেছে। আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হওয়ার পথে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আরেকটা দল 'তাহরিরুল ইসলামি' ইসলামি আন্দোলন। ইসলামি রাষ্ট্র ও ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য তারা প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

তবে সব দল ও জামায়াতের প্রভাব সমান নয়। প্রত্যেক দলরই কিছু সমস্যা আছে। চিন্তাগত পার্থক্য আছে। তাদের পথ ও পদ্ধতিতে ভিন্নতা আছে। কিন্তু সব দলরই একটা জায়গায় মিল আছে সেটা হলো– ইসলামের পতাকার উড্ডয়ন; আল্লাহর জমিনে আল্লাহ বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রচেষ্টা। তো এখন ছোটো-খাটো ব্যাপার নিয়ে মতভেদ করার, দূরে থাকার সময় নয়। এখন সময় ঐক্যের। সব মতপার্থক্য ভুলে এক কাতারে শামিল হয়ে কাজ করার সময়।

প্রত্যেক দলরই ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। নতুন বিপ্লব সূচিত করতে অনেক বড়ো অবদান রয়েছে। আমরা পুরোনো হোক বা নতুন কোনো দলকেই ভুলে যেতে চাই না। যেমন আজহার, জাইতুনিয়্যাহ, ভারতের দেওবন্দ এবং নদওয়াতুল উলামা, মদিনার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ– এমনই আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা যুগের পর যুগ ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তাহজিব-তমদ্দুন প্রচার করে আসছে।

নোট লিখুন

লেখক পরিচিতি

ইউসুফ আল কারজাভি।

আজকের দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ ও আলিম। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি অতুলনীয়। জাহেলিয়াতের নানা চ্যালেঞ্জের মুখে সৃষ্ট সন্দেহ-সংশয় নিরসনে প্রাজ্ঞতার সাথে কাজ করছেন।

১৯৬২ সালের মিশরে জন্ম নেওয়া এই মহান ব্যক্তিত্ব 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন'-এর অন্যতম আধ্যাত্মিক নেতা। পড়াশোনা করেছেন আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রজীবনেই শিক্ষকদের নিকট হতে 'আল্লামা' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। লিখেছেন শতাধিক গ্রন্থ। আলিমদের আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ইত্তেহাদুল আলামি লি উলামাইল মুসলিমিন'-এর সভাপতি ছিলেন। বিভিন্ন দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।

বর্তমানে কাতারে বসবাস করছেন। বিশ্ব ইসলামি আন্দোলনের অন্যতম অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

বিজয় হেসে-খেলে আসে না। এলোপাতাড়ি কর্মে বিজয়ের দেখা মেলে না। মাতাল উদ্ভট উটের পিঠে চড়েও বিজয় আসে না। বিজয় এত সহজ ব্যাপার না যে হাত বাড়ালেই কাছে চলে আসবে!

বিজয়ের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি, পথ-পদ্ধতি আছে। মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তার বর্ণনা দিয়েছেন। বান্দাদের সতর্ক করেছেন। নিয়ম-নীতি ও কৌশল মেনে চলার প্রতি জোর দিয়েছেন।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস
www.guardianpubs.com
9 789848 254752